ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা
মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১/চৈত্র ১৪০৭

সম্পাদনা পরিষদ

মোশারফ হোসেন
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
কাজী হাসান ইমাম
বেগম কঙ্কা জামিল

সম্পাদক

এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

লোকপ্রশাসন সাময়িকী

অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১/চৈত্র ১৪০৭

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের
ত্রৈমাসিক জার্ণাল

সম্পাদক ঃ এস, এম, জোবায়ের এনামুল করিম

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১৪০৭

টেলিফোন	ঃ	৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স	ঃ	৭৭১০০২৯
ই-মেল	ঃ	bpatc@bangla.net
বিপিএটিসি গ্রন্থাগার	ঃ	৩৫১.০০০৫
প্রচ্ছদ	ঃ	কাজী আজাদ
মূল্য	ঃ	পনের টাকা
মুদ্রণে	ঃ	**ইছামতি অফসেট প্রেস** ১/১ হাজীপাড়া, রামপুরা ঢাকা-১২১৯। ফোন ঃ ৪১৩৭৩৭, ৯৩৩৬০৩৮

LOKAPRASASANA SAMAYIKI

Vol. 18, March 2001/Chaitra 1407

Quarterly Journal of
Bangladesh Public Administration Training Centre
Editor : S. M. Zobayer Enamul Karim

© Bangladesh Public Administration Training Center 1407

Telephone	:	7710010-15 (PABX)
Fax	:	7710029
E-Mail	:	bpatc@ bangla. net
BPATC Library	:	351.0005
Cover Design	:	Qazi Azad
Price	:	Taka Fifteen only

লোকপ্রশাসন সাময়িকীতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব এবং এর জন্য সম্পাদনা পরিষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১/চৈত্র ১৪০৭

সূচিপত্র

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ঃ
একটি পর্যালোচনা ১
ড. মোঃ রুহুল আমিন

তত্ত্বধায়ক সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ২৩
রাকিবা ইয়াসমিন

Poverty Alleviation With Special Reference to Adarsha Gram (AG) : A Review of the Conditions of Six Adarsha Gram ৪৭
S. M. Zobayer Enamul Karim

বাংলাদেশে শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো ঃ একটি পর্যালোচনা ৭৯
মোঃ আসাদুজ্জামান

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা : নীতি ও কলা-কৌশল ১১৩
হোসাইন রিদওয়ান আলী খান

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ ঃ বহুমাত্রিক প্রভাব ১২৭
মোঃ শরীফ হাছান

আধুনিক লোক প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের অকার্যকারিতা ঃ
তত্ত্ব ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত ১৪৫
মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা

ড. মোঃ রুহুল আমিন *

Role of Parliamentary Committee System in Bangladesh : A Review

Dr. Md. Ruhul Amin

Abstract : In the democratic process/system almost all countries have committee systems which empowers the parliament to hold control and authority over the executive. In article 76 of the constitution of the People's Republic of Bangladesh the parliament is given such power. Though the Bangladesh parliament started with sufficient structures of committee system to ascertain transparency and accountability, it is not capable of doing its duty properly.

ভূমিকা

বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের কার্যাবলী একদিকে যেমন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি জটিল আকার ধারণ করেছে। ফলে আইনসভাগুলোর পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত বিচার বিবেচনা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাছাড়া, বর্তমানকালে আইনসভাগুলোর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধরনের বড় সংস্থা সকল বিষয়ে শান্ত ও সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বিশেষ উপযোগীও নয়। সুতরাং সীমিত সময়ের মধ্যে দক্ষতার সাথে আইনসভার কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রায় সকল দেশেই কমিটি ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত এর কিছু সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত যে সকল ছোট ছোট সংস্থার উপর আইন ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিস্তৃত বিচার-বিচেনার দায়িত্ব অর্পন করা হয় সেগুলোকে আইনসভার কমিটি বলে।[১]

আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা শ্রম বিভাজনের মাধ্যমে আইনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষণ সম্ভব করে; জনপ্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার কর্মকান্ড সম্পর্কে

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

জ্ঞাত হন এবং সরকারি নীতি বাস্তবায়ন বিষয়ে পর্যালোচনাকালে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন; প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক দর কষাকষি এবং সমঝোতা অর্জন সম্ভবপর করে তোলে এবং সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগ তথা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।[২] উন্নত বিশ্বে কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন ও সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বহুলাংশে অর্জিত হয়েছে। বস্তুত কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার উন্নত বিশ্বের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করেছে।[৩]

এ প্রবন্ধ মূলত একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা। এখানে বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিতহয় তা যথাযথভাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে কি না তা মূল্যায়ন করাই এ গবেষণার মূল লক্ষ্য। গবেষণায় বাংলাদেশের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। পর্যালোচিত রচনাগুলোর মধ্যে প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং অন্যান্য উৎস (Secondary Source) থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য দলিলপত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (The Constitution of the People's Republic of Bangladesh), গণ পরিষদ (Constituent Assembly), পার্লামেন্টের বিতর্ক (Debates), পার্লামেন্টের কার্য বিবরণীর সারাংশ (Summary of the Proceedings) ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

বৃটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও আইন সংক্রান্ত কাজের জন্য সংসদীয় কমিটিসমূহ গঠনের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, জাতীয় সংসদ সরকারি হিসেব কমিটি; বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং সংসদে কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবে।[৪] এ সকল কমিটির সদস্যগণ সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত বা স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন।[৫] কমিটিগুলোকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা স্থায়ী কমিটি ও অস্থায়ী কমিটি। স্থায়ী কমিটি একটি মাত্র বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত হয় না; এর উদ্দেশ্য ও কাজ স্থায়ী প্রকৃতির। এ শ্রেণীর কমিটির সদস্যগণ সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হন এবং এক একটি কমিটির উপর এক এক প্রকার কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অস্থায়ী কমিটি কোন নির্দিষ্ট বিল পরীক্ষা বা অন্য

কোন বিশেষ কাজের জন্য গঠিত হয় এবং সেই বিশেষ কাজ সমাপ্ত হলে তা ভেঙে যায়।[৬] নিম্নে কমিটিগুলোর গঠন ও কর্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদত্ত হলো।

(১) কার্য-উপদেষ্টা কমিটি ঃ সংসদ অধিবেশনের শুরুতে একটি কার্য-উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। স্পীকার অনধিক ১৫জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি মনোনীত করেন। এবং তিনি নিজেই উক্ত কমিটির সভাপতি হন।[৭] সংসদ-নেতার সাথে পরামর্শক্রমে যে সকল সরকারি বিল বা অন্যান্য কার্য কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য স্পীকার নির্দেশ দেন সেই সকল বিল ও অন্যান্য কার্যের স্তর বা স্তরসমূহের আলোচনার জন্য কি পরিমান সময় বরাদ্দ করা উচিত, সে সম্পর্কে সুপারিশ করা এ কমিটির কাজ।[৮]

(২) বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত অনধিক ১০জন সদস্যের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হয়।[৯] বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত সকল বিল পরীক্ষা করা এর দায়িত্ব। এই বিলগুলো সংসদে আলোচিত হওয়ার পূর্বেই কমিটি তা পরীক্ষা করে এবং সেগুলোকে প্রকৃতি, অবিলম্বতা ও গুরুত্ব অনুসারে 'ক' ও 'খ' দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে। বিলগুলো আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে কতটা সময় দেয়া হবে এবং বেসরকারি সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় আলোচনার জন্য সময় সীমা কি হবে সে সম্পর্কে কমিটি সুপারিশ করে।[১০]

(৩) বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি ঃ যখন কোন বিল সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সদস্য বিলটিকে বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব করেন, কেবল তখনই এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট নেই। বিভিন্ন বিল বিবেচনার জন্য বিভিন্ন বাছাই কমিটি নিয়োগ করা হলে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিলের বিচার-বিবেচনা করে এর উন্নয়ন সাধনের জন্য সুপারিশ করে। বাছাই কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারার সংশোধনের জন্যও প্রস্তাব করতে পারে। সংসদ কোন বাছাই কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়-সীমা নির্ধারিত করে না দিলে উক্ত রিপোর্ট বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাবটি সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার তারিখ হতে তিন মাস সমাপ্তির পূর্বে পেশ করতে হয়।[১১]

(৪) পিটিশন কমিটি ঃ স্পীকার অন্যূন ১০জন সদসের সমন্বয়ে এই কমিটি মনোনয়ন করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য মনোনয়ন করা হয় না এবং এই কমিটিতে মনোনয়নের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না।[১২] বিল বা অন্যান্য

বিষয় সম্পর্কে জনসাধারণ জাতীয় সংসদের নিকট যে আবেদন করে তার বিবেচনা করা এবং সংসদের নিকট ঐ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা এই কমিটির প্রধান কাজ।[১৩]

(৫) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে অনধিক ১৫জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটিতে নিযুক্ত করা হয় না, এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। সরকারের বিভিন্ন হিসেব পরীক্ষা করা এই কমিটির কাজ। মহা-হিসেব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের রিপোর্ট পরীক্ষা, সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছে তা সংসদের আইন অনুসারে প্রদত্ত কিনা এবং সংসদ যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করে তা সঠিকভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা কমিটি এর কারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করে এবং নিজের সুপারিশ প্রদান করে। বিধি সম্মতভাবে মহা-হিসেব-নিরীক্ষক যে সকল কর্পোরেশন, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হিসেব নিরীক্ষা করে সেগুলোর হিসেব পরীক্ষা করাও এর কর্তব্য।[১৪]

(৬) অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ১০জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি নিয়োগ করেন। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয় না এবং এই কমিটিতে নিয়োগের পর কোন সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে, অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ হতে তিনি আর কমিটির সদস্য থাকেন না। ইহা অনুমিত হিসেবসমূহ পরীক্ষা করে এবং (ক) কিভাবে মিতব্যয়িতা, সাংগঠনিক উন্নতি বিধান, কর্ম দক্ষতা বা প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করা যায় সে সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করে; (খ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও আর্থিক মিতব্যয়িতা আনয়ন কল্পে বিকল্প নীতির সুপারিশ করে; (গ) অনুমিত হিসেবে গৃহীত নীতির পরিসীমার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে; (ঘ) অনুমিত হিসেবটি সংসদে কি আকারে পেশ করতে হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দেয়।[১৫]

(৭) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক মনোনীত অনধিক ১০জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। কোন মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নির্বাচন করা হয় না। এই কমিটির কাজ হল (ক) নির্দিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রিপোর্ট ও হিসেব পরীক্ষা করা; (খ) সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে মহা-হিসেব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কোন রিপোর্ট থাকলে তা পরীক্ষা করা; (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সুষ্ঠু ও বিচক্ষণ বাণিজ্যিক নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা করা;

(ঘ) সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে সব কাজ বর্তমানে আনুমানিক ব্যয়-হিসেব ও সরকারি হিসেব কমিটির উপর ন্যস্ত তা স্পীকার নির্দেশ দিলে বিচার বিবেচনা করে দেখা।[১৬]

(৮) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ১০ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করেন।[১৮] এই কমিটি সংসদ এবং এর সদস্য বা কোন কমিটির বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করে। কোন অধিকার ভঙ্গের প্রশ্ন সংসদ কিংবা স্পীকার কমিটির নিকট পেশ করলে কমিটি তা পরীক্ষা করে, প্রয়োজনমত অনুসন্ধান চালায়, কোন অধিকার ভঙ্গ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে এবং সে সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদান করে।[১৯]

(৯) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ঃ সংসদ অনধিক ৮জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠন করেন।[২০] কমিটির কাজ হলো, মন্ত্রী কর্তৃক সংসদে সময়ে সময়ে যে সকল প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ইত্যাদি দেন তার কতখানি কার্যে পরিণত করা হয়েছে এবং সময়মত কার্যকর করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সংসদের নিকট রিপোর্ট পেশ করা।[২১]

(১০) কতিপয় অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ প্রত্যেক নতুন সংসদের উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করেন[২২] এবং প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ অনধিক ১০ জন সদস্য থাকেন। প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্তত পক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং স্থায়ী কমিটির কাজ হলো সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রনালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা ও সুপারিশ প্রদান করা।[২৪]

(১১) সংসদ কমিটি ঃ স্পীকার কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ অনধিক ১২জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৫] সংসদ সদস্যদের আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করা এই কমিটির প্রধান কাজ।[২৬]

(১২) লাইব্রেরী কমিটি ঃ স্পীকার কর্তৃক সংসদ হতে মনোনীত ৯জন সদস্য এবং ডেপুটি স্পীকারের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৭] ডেপুটি স্পীকার পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি হন। কমিটির কাজ হলো (ক) লাইব্রেরী সংক্রান্ত যে সব বিষয় সময়ে সময়ে স্পীকার কমিটির নিকট প্রেরণ করেন তা

বিবেচনা করে পরামর্শ দান করা (খ) লাইব্রেরীর উন্নতি বিধানের জন্য পরামর্শদান করা এবং (গ) লাইব্রেরী কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সদস্যগণকে সাহায্য করা।[২৮]

(১৩) কার্য প্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ঃ সংসদ কর্তৃক মনোনীত সভাপতিসহ ১২জন সদস্যের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[২৯] স্পীকার পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতিহন। এই কমিটি সংসদের কার্যের পদ্ধতি ও পরিচালনা সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনা করে এবং এর উন্নতির জন্য কোন বিধির সংশোধন বা সংযোজনের সুপারিশ করতে পারে।[৩০]

(১৪) বিশেষ কমিটি ঃ সংসদ কোন প্রস্তাব দ্বারা এমন বিশেষ কমিটি নিয়োগ করতে পারেন, যার গঠন ও কাজ এই প্রস্তাবে যেরূপ নির্ধারিত থাকবে, সেরূপ হবে।[৩১]

উপরোক্ত প্রত্যেকটি কমিটির একজন সভাপতি থাকেন। শুধুমাত্র কার্য প্রণালী–বিধি কমিটি ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হন স্পীকার। এবং অন্যান্য কমিটির সভাপতি সংসদ কর্তৃক মনোনীত হন। তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীগণই প্রত্যেকটি কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। প্রত্যেক কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

কমিটিগুলোর বৈঠকে কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, এবং উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যা-গরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারে। সংসদের বৈঠক চলাকালেও কমিটির বৈঠক বসতে পারে এবং কমিটির পক্ষ হতে কমিটির সভাপতি সংসদে এর রিপোর্ট পেশ করেন।

তৃতীয় পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

৭মে ১৯৮৬ নির্বাচিত বাংলাদেশের তৃতীয় পার্লামেন্ট ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭ ভেঙে দেওয়া হয়। এবং উক্ত সময়কালে এ পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে চারটি অধিবেশনে ৭৫টি কর্মদিবসে (Working day) ৩৬৭.৪১ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৩২]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠিত হয় এবং গঠিত ১টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[৩৩]

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে ৯ সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন এবং ২৪০ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি' ও ২৬৪ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৩৪] অধিবেশনের অস্টম বৈঠকে ২৬৪ বিধি অনুসারে গঠিত 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুনর্গঠিত করা হয়।[৩৫]

তৃতীয় অধিবেশনকালে মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ২৭তম বৈঠকে দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধি, ট্রাক দুর্ঘটনা ও যানজট ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সর্বসম্মত সমধানের লক্ষ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২৩ সদস্য সমন্বয়ে ১টি [৩৬] এবং অধিবেশনের ৩৯তম বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করা সম্পর্কে সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মোট ২৪ সদস্য সমন্বয়ে ১টি মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৩৭]

চতুর্থ অধিবেশনকালে একটি সংসদীয় কমিটি মনোনীত করা হয়। অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে স্পীকার কার্য প্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি' মনোনীত করেন।[৩৮]

প্রতিবেদন

তৃতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত ৪টি সংসদীয় কমিটি এবং ২টি বিশেষ কমিটির মধ্যে শুধুমাত্র ১টি বিশেষ কমিটির ১টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়। যে বিশেষ কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয় তা হল-দেশে বাস ভাড়া বৃদ্ধি, ট্রাক দুর্ঘটনা ও যানজট ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতির সর্বসম্মত সমাধানের লক্ষ্য সম্পর্কিত। ৪টি সংসদীয় কমিটি এবং ১টি বিশেষ কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

চতুর্থ পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

৩ মার্চ ১৯৮৮ নির্বাচিত বাংলাদেশের চতুর্থ পার্লামেন্ট ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ ভেঙে দেওয়া হয়। এ সময়কালে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত থেকে সাতটি অধিবেশনে ১৬৮টি কার্যদিবসে ৮০৫ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৩৯]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ১১টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠন করা হয়। এছাড়া ৩২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং ৩টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদের 'কার্য উপদেষ্টা কমিটি', ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন এবং ২৪০ বিধি অনুসারে সংসদে ১০ সদস্যের সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৪০]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে স্পীকার ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে কার্য প্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে 'পিটিশিন কমিটি' ও ২৫৭ বিধি অনুসারে 'লাইব্রেরী কমিটি' মনোনীত করেন। এছাড়া কার্য প্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'বেসরকারি সংসদ সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি, ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি, ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি এবং ২৬৪ বিধি অনুসারে 'কার্য প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৪১]

অধিবেশনের বিভিন্ন বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে মোট ৩২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে, অধিবেশনের ১০ম বৈঠকে (১) প্রতিরক্ষা (২) মৎস্য ও পশুপালন, (৩) পররাষ্ট্র এবং (৪) অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি [৪২], অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে (৫) সংস্থাপন, (৬) ধর্ম ও (৭) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি[৪৩], অধিবেশনের ১৩তম বৈঠকে (৮) ডাক ও টেলিযোগাযোগ (৯) খাদ্য এবং (১০) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি[৪৪], অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে (১১) তথ্য (১২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৬], অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে (১৫)

পূর্ত (১৬) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৭], অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে (১৭) শ্রম ও জনশক্তি, (১৮) সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৮], অধিবেশনের ১৮তম বৈঠকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা (২০) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৪৯], অধিবেশনের ১৯তম বৈঠকে (২১) যোগাযোগ (২২) নৌ-পরিবহণ (২৩) বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫০], অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে (২৪) বাণিজ্য (২৫) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫১], অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে (২৬) ভূমি (২৭) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫২], অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে (২৮) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় (২৯) স্বরাষ্ট্র (৩০) শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৫৩] এবং অধিবেশনের ২৪তম বৈঠকে (৩১) কৃষি (৩২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।৫৪

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে দেশের 'উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কে, ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, চতুর্থ অধিবেশনের কমিটিতে সংসদ সদস্য সংখ্যা আরও ৫জন বৃদ্ধি করে মোট ১৭জন করা হয়।[৫৫]

অধিবেশনের চতুর্থ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে ১০জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদে উত্থাপিত 'দন্ডবিধি (সংশোধন), বিল ১৯৮৮' সম্পর্কে বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[৫৬]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পূণর্গঠন, ৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৫৭]

অধিবেশনের চতুর্থ ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী প্রথম অধিবেশনে গঠিত কার্য প্রণালী বিধিতে 'স্থায়ী কমিটি'[৫৮] পূণর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে (১) শ্রম ও জনশক্তি (২) মৎস্য ও পশুপালন (৩) নৌ-পরিবহণ (৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং (৫) পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি পরিবর্তন করা হয়।[৫৯]

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ১২জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'দেশের বন্যা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে' ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৬০]

চতুর্থ অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন, ১টি কমিটির ২ বার রদবদলসহ ১৪টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য ১৫ বার রদবদল করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫জন বৃদ্ধি করা হয়।

অধিবেশনের ৩৩তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৬, ২৩৯ ও ২৪৫ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি' 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' এবং 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির' সংসদ সদস্য পরিবর্তন করা হয়।[৬১]

অধিবেশনের একই বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত ১৪টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫জন সংসদ সদস্য রদবদল করা হয়। এগুলো হচ্ছে, (১) স্বাস্থ্য ও পরিবার (২) সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ (২বার) (৩) কৃষি (৪) যোগাযোগ (৫) খাদ্য (৬) তথ্য (৭) পররাষ্ট্র (৮) মৎস্য ও পশু সম্পদ (৯) সমাজকল্যান ও মহিলা বিষয়ক (১০) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ (১) নৌ-পরিবহণ (১২) যুব ও ক্রীড়া (১৩) ভূমি এবং (১৪) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৬২]

অধিবেশনের ৩৪তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রথম অধিবেশনের গঠিত উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সম্পর্কিত কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ৫জন বৃদ্ধি করা হয়। ৫জন বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিটির সংসদ সদস্য সংখ্যা ১৭তে উন্নীত হয়।[৬৩]

পঞ্চম অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি পুনর্গঠন এবং ১টি সংসদীয় কমিটির ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এছাড়া ২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন, ৮টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংসদ সদস্য রদবদল ও ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শুন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয় এবং ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সংসদ কমিটি' স্পীকার পুনর্গঠন করেন[৬৪] এবং

অধিবেশনের ২৩তম বৈঠকে ২৬৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত কার্য প্রণারী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি শূন্য পদ পূরণ করা হয়।[৬৫]

অধিবেশনের ২৬তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে ১০জন করে সংসদ সদস্য সমন্বয়ে (১) মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং (২) বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[৬৬]

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির সংসদ সদস্য পরিবর্তন এবং ৩টি কমিটির ১টি করে শুন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয়। এগুলো হচ্ছে (১) স্বরাষ্ট্র (২) খাদ্য (৩) সমাজকল্যান (৪) ত্রাণ ও পূনর্বাসন (৫) কৃষি (৬) শ্রম ও জনশক্তি (৭) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং (৮) এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি (সংসদ পরিবর্তন)। এছাড়া, বেসামরিক বিমান, পাট এবং বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্য সংসদ সদস্য পদ পূরণ করা হয়।[৬৭]

অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৩জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে সংসদের সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখা সম্পর্কে সংসদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন ও মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদানের নিমিত্তে ১টি[৬৮] এবং অধিবেশনের ২০তম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ১১ সংসদ সদস্য সমন্বয়ে 'শ্রম আইন পর্যালোচনার উদ্দেশ্য' ১টি মোট ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৬৯]

ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয় এবং ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ৩৫তম ও শেষ বৈঠকে কার্য প্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে বিগত অধিবেশনসমূহে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৭০]

অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে ২৯ জন সংসদ সদস্য 'স্বাস্থ্য নীতি' সম্পর্কে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৭১]

বৈঠক

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয়, ৩৪টি মন্ত্রনালয়, ৫টি বিশেষ ও ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৫১টি কমিটি এবং এসব কমিটি

কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটি চতুর্থ জাতীয় সংসদের মেয়াদকালে মোট ৮১৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১১টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

৫১টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৬০টি এবং মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত ৬টি উপ-কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩টি, মোট ৩৫৩টি। ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে মূল কমিটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন

বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৪টি কমিটির ৬টি রিপোর্ট, ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে ৩টি কমিটির ৩টি রিপোর্ট এবং ১টি বিশেষ কমিটির ২টি রিপোর্টসহ মোট ১১টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়।

সংসদীয় কমিটি ৭টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩১টি, ৪টি বিশেষ এবং ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৪৩টি কমিটি কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী সংসদীয় ৪টি কমিটি হচ্ছে (১) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২টি (২) অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি ১টি (৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ২টি (৪) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ১টি। বাকী ৭টি সংসদীয় কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত যে ৩টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করে সেগুলো হলো-(১) আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (২) জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৩) ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি। বাকী ৩১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বিশেষ ১টি কমিটি হলো-দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের 'উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশেষ কমিটি' ২টি। বাকী ৪টি বিশেষ কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

পঞ্চম পার্লামেন্টে কমিটির ভূমিকা

পঞ্চম পার্লামেন্ট ৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ২২টি অধিবেশনে মোট ৪০০ (সরকারি ৩৩৩+বেসরকারি ৬৭) কার্যদিবসে ১৮৩৪.১২ ঘন্টা সময় ব্যয় করে।[৭২]

কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে ৩টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত ও গঠন করা হয়। অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে স্পীকার জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণারী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' এবং ২৪৯ বিধি অনুসারে ১২ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সংসদ কমিটি' মনোনীত করেন।[৭৩]

অধিবেশনের দশম বৈঠকে ২২২ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য প্রধান মন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে 'বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৪]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে ৫টি সংসদীয় কমিটি, ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৯টি কমিটি গঠন করা হয়। অধিবশনের ১৬তম বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি', ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২জন সদস্য সমন্বয়ে 'কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'[৭৫] এবং অধিবেশনের ২১তম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৬] অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে 'আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন করা হয়।[৭৭]

অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে সংসদে উত্থাপিত 'সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল' ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবনায় ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয় এবং এ কমিটিতে আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে 'সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) বিল' ১৯৯১ বিরোধী দলীয় উপ-নেতা আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত ৪টি সংবিধান (সংশোধন) বিল ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য অর্থাৎ সংসদে উত্থাপিত আইন ও বিচার মন্ত্রীর ২টি ও বিরোধী দলীয় উপনেতার ৪টি মোট ৬টি সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য উক্ত বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়।[৭৮]

অধিবেশনের ১৭তম বৈঠকে আওয়ামী লীগ সদস্য সালাহ উদ্দিন ইউসুফের

প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত 'সংবিধান (সংশোধন) বিল ১৯৯১' সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২২৫ বিধি অনুযায়ী ১১ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি গঠন করা হয়।[৭৯]

অধিবেশনের ৩৯তম বৈঠকে বিরোধী দলীয় চীপ হুইপ মোঃ নাসিম কর্তৃক আনীত The Indemnity Ordinance, 1975 (১৯৭৫ সালের ৫০নং অধ্যাদেশ) বাতিল বিল ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ২৬৬ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৮০]

তৃতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি গঠন, ৩টি সংসদীয় কমিটি পুণর্গঠন ও ১টি সংসদীয় কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয় এবং ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ও ২টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে জাতীয় সংসদের কার্য-প্রণালী বিধির ২৪৫বিধি অনুসারে ৮ সদস্য সমন্বয়ে 'সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত অধিবেশনে ২১৯ বিধি অনুযায়ী ১৫ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত 'কার্য-উপদেষ্টা কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮১]

অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে ২৪০ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং ২৬৪বিধি অনুযায়ী ১২ সদস্য সমন্বয়ে মনোনীত 'কার্য প্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের একই বৈঠকে ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত' স্থায়ী কমিটির একটি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৮২]

অধিবেশনের ৭ম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে প্রতিটি কমিটিতে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে ৯টি, ৮ম বৈঠকে ১০টি ও ১৪টি মোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো হচ্ছে-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান, ত্রাণ, শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, যোগাযোগ, শিল্প, শ্রম ও জনশক্তি, সংস্কৃতি বিষয়াবলী, বাণিজ্য, সংস্থাপন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং সেচ পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য, মৎস্য ও পশু পালন, নৌ-পরিবহণ, বস্ত্র, পূর্ত, অর্থ, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[৮৩] এবং অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে পরিকল্পনা, বন ও পরিবেশ, ভূমি, সমাজকল্যান, যুব ও ক্রীড়া, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ, পাট, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন, কৃষি, ধর্ম বিষয়ক, মহিলা বিষয়ক, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[৮৪]

অধিবেশনের ৪র্থ বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপ-নেতার প্রস্তাব ক্রমে 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে' ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি [৮৫] এবং অধিবেশনের পঞ্চম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদে উত্থাপিত ৫টি বিল (বিলের নাম) সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি মোট ২টি কমিটি গঠন করা হয়।[৮৬]

চতুর্থ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি মনোনীত করা হয়। অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'পিটিশন কমিটি' এবং ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'লাইব্রেরী কমিটি' মনোনীত করেন।[৮৭]

ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের ১৪তম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' ও 'খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮৮]

অষ্টম অধিবেশনকালে ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন করা হয়। অধিবেশনের ৩২তম বৈঠকে ২৪৬ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'যোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' পুণর্গঠন করা হয়।[৮৯]

দশম অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় কমিটি ও ৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ এবং ২টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ২৯তম বৈঠকে ২৩৪ বিধি অনুসারে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত' স্থায়ী কমিটির ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯০] ২৪৬ বিধি অনুসারে গঠিত ডাক ও টেলিযোগাযোগ, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন, মহিলা বিষয়ক ও ত্রান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। এবং অধিবেশনের একই বৈঠকে- পরিকল্পনা ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১জন করে সদস্য পরিবর্তন করা হয়। একই বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) মজিদ-উল হকের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সদস্য তোফায়েল আহমদের আনীত দূর্নীতির অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৯১]

দ্বাদশ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন ও ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। অধিবেশনের ১৩তম বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত বাণিজ্য মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং শিল্প

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য পরিবর্তন করা হয়।[৯২] ১৪তম বৈঠকে ২৬৬ বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ (স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল ১৯৯৩ পর্যালোচনাপূর্বক জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ১৫ সদস্য সমন্বয়ে ১টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[৯৩]

ত্রয়োদশ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি পুণর্গঠন ও ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১০ম বৈঠকে ২২২ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'বেসরকারি সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি' এবং ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি', পুণর্গঠন করা হয়।[৯৪] একই বৈঠকে ২৪৬-২৪৭ বিধি অনুসারে ১০জন করে সদস্য সমন্বয়ে গঠিত 'পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং 'ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৫]

সপ্তদশ অধিবেশনকালে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ১টি স্থায়ী কমিটি গঠন ও ৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন ও ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১২তম বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য সমন্বয়ে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' গঠন এবং একই বৈঠকে তথ্য, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুণর্গঠন করা হয়। একই বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি সদস্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৬]

অষ্টাদশ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় কমিটি ও ২টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ১৬তম বৈঠকে ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত 'অনুমিত হিসেব সম্পর্কিত কমিটি', ২৩৯ বিধি অনুসারে গঠিত 'সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি' এবং ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত 'মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি' এবং 'গৃহায়ন ও গণ পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি করে শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৭]

ঊনিশতম অধিবেশনকালে ১টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শূন্যপদ পূরণ করা হয়। অধিবেশনের ৩য় বৈঠকে ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত 'ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র ১টি শূন্যপদ পূরণ করা হয়।[৯৮]

বৈঠক

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয়, ৩৫টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৫টি বিশেষ কমিটি ও ২টি বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি মোট ৫৩টি কমিটি এবং এসব কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ কমিটি পঞ্চম জাতীয় সংসদের পাঁচ বছর (১-৬-৯১ থেকে ৩০-৬-৯৫ পর্যন্ত) মেয়াদকালে মোট ১৮০৬টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৩৬টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

৫৩টি কমিটির মধ্যে ১১টি সংসদীয় কমিটির ৩৪৭টি এবং মূল কমিটি কর্তৃক গঠিত ৪টি উপ-কমিটির ১১৯টিসহ মোট ৪৬৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১০২৭ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে গঠিত ২৫টি উপ-কমিটির ২৫৫টি বৈঠকসহ সর্বমোট ১২৮২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ৫টি বিশেষ কমিটির ৫৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদন

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৬টি কমিটির মোট ২৬টি রিপোর্ট, ৩৫টি মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত কমিটির মধ্যে ৮টি কমিটির ৮টি রিপোর্ট এবং ৫টি বিশেষ কমিটির মধ্যে ১টি কমিটির ২টি রিপোর্টসহ মোট ৩৬টি রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়।

সংসদীয় কমিটি ৫টি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২৭টি ও বিশেষ কমিটি ৪টি মোট ৩৬টি কমিটি কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী সংসদীয় ৬টি কমিটি হচ্ছে--(১) পিটিশন কমিটি ২টি (২) সরকারি হিসেব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৪টি (৩) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি ২টি (৪) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৮টি (৫) সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৬) কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৯টি। বাকী ৫টি সংসদীয় কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মন্ত্রনালয় সম্পর্কিত যে ৮টি কমিটি সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপন করে, সেগুলো হলো- (১) কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি, (২) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৩) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৪) বিদ্যুৎ জ্বালানী ও

খনিজ সম্পদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৬) নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি (৭) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১টি। বাকী ২৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনকারী বিশেষ ১টি কমিটি হচ্ছে-কার্য প্রণালী-বিধির ২৬৬বিধি অনুসারে ১৩.৭.৯৩ তারিখে গঠিত বিশেষ কমিটি ২টি, বাকী ৪টি বিশেষ কমিটির কোনো রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি।

মূল্যায়ন

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত কমিটি কাঠামো নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও কমিটিগুলো যথাযথ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি অর্থাৎ কমিটিগুলোর যথার্থ সংখ্যক রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হয়নি। কারণ বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা মোটামুটি বৃটেন ও ভারতের কমিটি ব্যবস্থার মত হলেও কমিটিগুলো মার্কিন কংগ্রেসের কমিটিগুলোর মত ততখানি ক্ষমতাশালী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমিটিগুলোই অধিকাংশ বিল উত্থাপন করে এবং বিল উত্থাপিত হওয়ার পর কংগ্রেসে আলোচনা হওয়ার পূর্বেই তা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলের আমূল পরিবর্তন করতে পারে। এমন কি, কোন বিল বিবেচনা না করে ফেলে রাখতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশ সংসদে কোন বিল সাধারণ আলোচনার পর নীতিগতভাবে গৃহীত হলে কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলের উদ্দেশ্য বা নীতির পরিবর্তন করতে পারে না এবং ইহা ফেলে রাখতেও পারবে না। কমিটি প্রত্যেক বিল সম্পর্কে ইহার সুপারিশ ও রিপোর্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংসদে পেশ করতে বাধ্য।[৯৯]

তথ্য নির্দেশিকা

১. ডঃ আবুল ফজল হক, ***বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*** (রংপুর ঃ টাউন স্টোরস, ১৯৯৮) পৃ. ৩৩৬-৩৩৭।

২. ডঃ মোঃ রুহুল আমিন, ***বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঃ এর কার্যকারিতা*** (১৯৮৬-১৯৯৫) [অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস] (রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১), পৃ. ১০২-১০৩।

৩. ঐ।

৪. ***The Constitution of the People's Republic of Bangladesh*** (Dhaka : Government Printing Press, Tejgaon, 1996), p. 61-63.

৫. মোঃ রুহুল আমিন, ***বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা*** [অপ্রকাশিত এম. ফিল থিসিস] (রাজশাহী ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ১৫২।

৬. ডঃ মোঃ রুহুল আমিন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ*——, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৭. ***গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি,*** ঢাকা, ১৯৯২, বিধি ২১৯, পৃ. ৮০।

৮. ঐ, বিধি ২২০, পৃ. ৮০।

৯. ঐ, বিধি ২২২, পৃ. ৮১।

১০. ঐ, বিধি ২২৩, পৃ. ৮১।

১১. ঐ, বিধি ২২৫, পৃ. ৮১-৮৩।

১২. ঐ. বিধি ২৩১, পৃ. ৮৩।

১৩. ঐ, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৪. ঐ, বিধি ২৩৩, পৃ. ৮৪-৮৫।

১৫. ঐ, বিধি ২৩৫, ২৩৬ ও ২৩৭, পৃ. ৮৫-৮৬।

১৬. ঐ, বিধি ২৩৮ ও ২৩৯, পৃ. ৮৬-৮৭।

১৭. ঐ, বিধি ২৪০, পৃ. ৮৭।

১৮. গণপ্রজাতন্ত্রী ***বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি,*** ঢাকা, ১৯৯২ বিধি ২৪১, পৃ. ৮৭৮৮।

১৯. ঐ, বিধি ২৪৫, পৃ. ৮৮; ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৩৮।

২০. ঐ, বিধি ২৪৪, পৃ. ৮৮।

২১. ঐ, বিধি ২৪৬, পৃ. ৮৮।

২২. ঐ, বিধি ২৪৭, পৃ. ৮৯।

২৩. ঐ, বিধি ২৪৮, পৃ. ৮৯।

২৪. ঐ, বিধি ২৪৯, পৃ. ৮৯।

২৫. ঐ, বিধি ২৫০, পৃ. ৮৯।

২৬. ঐ, বিধি ২৫৭, পৃ. ৯১।

২৭. ঐ, বিধি ২৫৮, পৃ. ৯১।

২৮. ঐ, বিধি ২৬৪, পৃ. ৯২।

২৯. ঐ বিধি ২৬৩, পৃ. ৯২।

৩০. ঐ, বিধি ২৬৬, পৃ. ৯২।

৩১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ***বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (জুলাই ১৯৮৭) কার্যবাহের সারাংশ ।***

৩২. Khaleda Habib, *Bangladesh Elections*, ***Parliament and the Cabinet*** 1970-91, Dhaka, 1991, P. 84; বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ***বাংলাদেশ তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (জুলাই, ১৯৮৬), দ্বিতীয় (নভেম্বর, ১৯৮৬), তৃতীয় (১৯৮৭) ও চতুর্থ (বাজেট, ১৯৮৭) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***

৩৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২, ১৪ জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ১০৮-১১০।

৩৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৮, ২২ জুলাই, ১৯৮৬, পৃ. ৩৯১-৩৯৩।

৩৫. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-২৭, ৮ মার্চ, ১৯৮৭, পৃ. ২১৬১-২১৬২।

৩৬. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৩৯, ২৩ মার্চ, ১৯৮৭, পৃ. ৩৫৩৪-৩৫৩৬।

৩৭. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১, ১১ জুন, ১৯৮৭, পৃ. ৬০-৬১।

৩৮. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২, ২৮ এপ্রিল, ১৯৮৮।

৩৯. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ*, ***বাংলাদেশ চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম (১৯৮৮-১৯৯০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***

৪০. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৪, ৩মে, ১৯৯৮।

৪১. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১০, ১১মে, ১৯৮৮।

৪২. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১২, ২২ মে, ১৯৮৮।

৪৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৩, ২৩ মে, ১৯৮৮।

৪৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৪, ২৪ মে, ১৯৮৮।

৪৫. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৬, ২৬মে, ১৯৮৮।

৪৬. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৬, ২৬ মে, ১৯৮৮।

৪৭. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৭, ২৯মে, ১৯৮৮।

৪৮. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৮, ৩০ মে, ১৯৮৮।

৪৯. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৯, ৩১ মে, ১৯৮৮।

৫০. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২০, ১ জুন, ১৯৮৮।

৫১. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২১, ২ জুন, ১৯৮৮।

৫২. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২৩, ৬ জুন, ১৯৮৮।

৫৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-২৪, ৭ জুন, ১৯৮৮।

৫৪. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৪, ৩ মে, ১৯৮৮।

৫৫. ঐ।

৫৬. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১, ১৬ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-২, ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩, ১৮ অক্টোবর, ১৯৮৮; বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৪, ১৯ অক্টোবর, ১৯৮৮।

৫৭. ঐ।

৫৮. ঐ।

৫৯. ঐ।

৬০. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-৩৩, ৬ জুলাই, ১৯৮৯।
৬১. ঐ।
৬২. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-৩৪, ১৯৮৯।
৬৩. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-৫, ১০ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৪. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-২৩, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।
৬৫. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা ২৬, ৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।
৬৬. ঐ।
৬৭. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-১৬, ২৫ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৮. বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা-২০, ৩১ জানুয়ারী, ১৯৯০।
৬৯. বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা-৩৫, ১ আগষ্ট, ১৯৯০।
৭০. ঐ।
৭১. বিতর্ক, খন্ড-১ সংখ্যা-২, ৭ এপ্রিল, ১৯৯১।
৭২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ*, ***বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম-বাইশতম*** (৫ এপ্রিল ১৯৯১ থেকে ১৮ নভেম্বর ১৯৯৫) ***অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।***
৭৩. বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১০, ২৪ এপ্রিল, ১৯৯১।
৭৪. বিতর্ক খন্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই, ১৯৯১।
৭৫. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-২১, ১৫ জুলাই, ১৯৯১।
৭৬. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১৬, ৮ জুলাই, ১৯৯১।
৭৭. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-১৭, ৯ জুলাই, ১৯৯১।
৭৮. ঐ।
৭৯. বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৩৯, ৮ আগষ্ট, ১৯৯১।
৮০. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১২ ৩ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮১. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১৪, ৫ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮২. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৭, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৩. ঐ; বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৮, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৪. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১২, ৩ নভেম্বর, ১৯৯১।
৮৫. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৪, ১৫ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৬. বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-৫, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯১।
৮৭. বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১, ৪ জানুয়ারী, ১৯৯২।
৮৮. বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা-১৪, ৮ জুলাই, ১৯৯২।
৮৯. বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা-৩২, ১১ মার্চ, ১৯৯৩।
৯০. বিতর্ক, খন্ড-১০, সংখ্যা-২৯, ১৩ জুলাই, ১৯৯৩।
৯১. ঐ।

৯২. বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১৩, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
৯৩. বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১৪, ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।
৯৪. বিতর্ক, খন্ড-১৩, সংখ্যা-১০, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।
৯৫. বিতর্ক, খন্ড-১৭, সংখ্যা-১২, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪।
৯৭. বিতর্ক, খন্ড-১৮, সংখ্যা-১৬, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫।
৯৮. বিতর্ক, খন্ড-১৯, সংখ্যা-৩, ২৬ এপ্রিল, ১৯৯৫।
৯৯. ডঃ আবুল ফজল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫।

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

তত্ত্বধায়ক সরকার ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

রাকিবা ইয়াসমিন *

Care-Taker Government : Bangladesh Perspective

- Rakiba Yeasmin

Abstract : The main objective of the liberation movement was to establish a well-balanced system of democratic government in Bangladesh. To achieve this objective the mass participated the straggle for freedom several times and sacrificed a lot. The prerequisites for the restoration of democracy are to ensure the right of voting-power through fair and impartial election and to establish a responsible parliamentary type of government. But as the democracy in our country is still in its developing form so it needs a constitutional arrangement for the well-running of democracy. The 6th national parliament of Bangladesh passed the 13th amendment Bill of the constitution on March 28th, 1996 which is mostly known as the Care-Taker Government Bill.

It is Pertinently to mention that a non party impartial Care-Taker Government was formed on December 6,1990 to conduct a free and fair election. The fifth parliament election was held under this Government on the 27th February, 1991. Later on by the 13th Amendment Bill of the Constitution a new example was set up in the democratic system of government and an unprecedented idea was added to it.

This paper aims to include discussion on the necessity of Care-taker government in the context of Bangladesh. The 13th Amendment Bill of the constitution, the question of referendum as to give the 13th Amendment Bill a constitutional validity, the reaction of the politicians to it, a comparative study of the two preceding care-taker governments and the future applicability of the said government for the interest of the country have been discussed in this article.

ভূমিকা

বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ও সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ধারনাটি বিভিন্নভাবে এসেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়। সামরিক শাসক এরশাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলন শেষে ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর সব রাজনৈতিক দল সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের উদ্দেশ্য হ'ল অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান। ১৯৯১ এর ২৭ ফেব্রুয়ারী সফলভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন পরিচালিত হওয়ায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বজনগ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। ফলে বর্তমানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসু করার জন্য তত্ত্বধায়ক সরকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কিন্তু একটা নতুন ধারণা হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে বিপক্ষে রয়েছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার উত্তম সরকার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশে অতি অল্প সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি সাংবিধানিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে।

উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক দিকসহ বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর সফলতা ও ব্যর্থতা, সাংবিধানিক আইনের বিভিন্ন দিক ও রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ফলপ্রসু করার বিভিন্ন দিক আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

পদ্ধতি

গবেষণা কর্মে অনুসৃত প্রধান পদ্ধতিগুলো হচ্ছে

প্রথমতঃ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত এ বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন লেখকের লেখা, জার্নাল, বই পত্র, সমীক্ষা ও অন্যান্য প্রকাশনাকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিশেষত: ১৯৯০ এর ডিসেম্বর থেকে '৯১ মার্চ এবং '৯৬ এর জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো এবং এ সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও বই থেকে সংগৃহিত তথ্যগুলোকে গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো ঃ নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু মতবাদ বলা যায়। নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং এমনকি

এ উপমহাদেশে ও দূর অতীত কাল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আকাংখা প্রবলভাবে অনুভূত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে ও সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকার" ধারনাটিকে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার শব্দটিকে নিম্নোক্ত তিনটি অর্থে ব্যবহার করা যায় ঃ

(ক) অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

(খ) বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এবং

(গ) প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার।

ক. অনুমিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার

আস্থা ভোটে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রীর পতন বা মেয়াদ শেষে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আইন পরিষদ ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্তবর্তীকালীন সময়ের জন্য ক্ষমতাসীন সরকারই অন্তবর্তীকালীন সরকারে রূপান্তরিত হয়। নির্বাচন পূর্ববর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের এরূপ রূপান্তরকে অনেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে থাকেন। (A. K. Brohi, 1958 : 116)

এরূপ রূপান্তর পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই স্বীকৃত। বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় থাকা অবস্থাতেই নির্বাচন হয়; নির্বাচনের পূর্বে তাকে পদত্যাগ করতে হয় না। পাকিস্তানে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে "তত্ত্বাবধায়ক সরকারে পরিণত করার বিধান ছিল। (তারেক শামসুর রহমান (সম্পা.), ১৪৩)। কিন্তু এরূপ রূপান্তরিত অন্তবর্তীকালীন সরকারকে প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা যায় না। কারণ ক্ষমতায় থেকেই এ সরকার নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ফলে তত্ত্বাবধায়নের প্রকৃত কাজটি তার দ্বারা সম্ভবপর হয় না।

খ. বিশেষ অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ পরিস্থিতিতে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে বা সাংবিধানিক বিধানের মাধ্যমে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ঠভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান রাখা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমি ইংল্যান্ডে সম্ভবত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় তৎকালীন পদত্যাগী প্রধান মন্ত্রী উইনস্টন স্পেন্সসার চার্চিলের নেতৃত্বে, ১৯৪৫ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেইন-এর স্থলে চার্চিলকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়। উদ্দেশ্য, যে-কোন মূল্যে নাৎসি

জার্মানির বিরুদ্ধে জয়লাভ, এরা দু'জনই ছিলেন রক্ষণশীল দলের নেতা। চলমান যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংল্যান্ডের তিনটি প্রধান দলই নির্বাচনের বদলে একটি কোয়ালিশন সরকার চাচ্ছিল। চার্চিল সর্বদলীয় একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলেন। এজন্য এ সরকারটি একটি জাতীয় সরকার হিসেবেও গণ্য। চার্চিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড ও মিত্র শক্তি যুদ্ধে ব্যাপকভাবে জয়ী হয়। যুদ্ধ জয়ের পর চার্চিল তার বিজয়ের সুনাম কাজে লাগিয়ে পরবর্তী নির্বাচনের সুবিধা নিতে পারেন এমন কথা আলোচিত হতে থাকে। এ অবস্থায় চার্চিল সর্বদলীয় জাতীয় সরকারের প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন ১৯৪৫ সালের ২৩মে। সাথে সাথেই রাজা তাকে একটি নতুন সরকার গঠনের আহ্বান জানান। (মিজানুর রহামন খান, ১৯৯৫ ঃ ১৩) Sir Ivor Jennings উইনষ্টন চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত এ মন্ত্রীসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে অভিহিত করেছেন। চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন চার্চিলের রক্ষণশীল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ক্লিমেন্ট রিচার্ড অষ্টলির নেতৃত্বে শ্রমিকদল ব্যাপক বিজয় লাভ করে ও সরকার গঠন করে। এ অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের পথ ধরেই পরবর্তীতে বৃটেনে কনভেনশন গড়ে উঠে যে, নির্বাচন পূর্ববর্তী একটি অন্তবর্তীকালীন সময়ে ক্ষমতাসীন সরকার আপনা-আপনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারে রূপান্তর লাভ করে। আবার পাকিস্তানের সংবিধানের ৪৮(৫) অনুচ্ছেদে রয়েছে বহুল আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান। এখানে তত্ত্বাবধায়ক ক্যাবিনেট গঠন সম্পর্কে কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। নির্দলীয় নিরপেক্ষ লোক নিয়োগের কোন বাধ্যবাধকতা নেই; যারা তত্ত্বাবধায়ক ক্যাবিনেটে থাকবেন তাদেরকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ বিধান অনুসারে ১৯৮৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক নিহত হওয়ার পর পাকিস্তানে প্রথমবারের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে দুর্বল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বেনজির ভুট্টো সরকার গঠন করেন। এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান বেনজিরকে বরখাস্ত করেন এবং নতুন নির্বাচনের তফসীল ঘোষণা করেন। বেনজির সুপ্রীম কোর্টে গমন করেন। যেমনটা গিয়েছিলেন জুনেজো। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে সমুন্নত রাখেন। দ্বিতীয়বার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯০ সালের অক্টোবরে নির্বাচন হয়। উক্ত নির্বাচনেও কেয়ারটেকার সরকারের মন্ত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। (মিজানুর রহমান খান, ১৯৯৫

ঃ ১৩)। সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকলেও পাকিস্তানের এ দু'টি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রকৃত অর্থে তত্বাবধায়ক সরকারের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ এ দু' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মন্ত্রীরা নির্বাচনে অংশগ্রহন করে এবং ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনা হয়।

গ. প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলতে নির্বাচনকে প্রভাবমুক্ত অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করার জন্য অন্তবর্তীকালীন এমন একটি সরকারকে বুঝায়- যা সম্পূর্ণভাবে নির্দলীয় এবং নির্বাচনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ থেকে ঐ সরকারের প্রত্যেক সদস্য বিরত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে বিধান সংযোজন করা হয়েছ এতে প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পাকিস্তানের ইতিহাসের সবচেয়ে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর ফর্মূলা অনুসারে, ক্ষমতার মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান নওয়াজ ও ইসহাক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে আসেন মঈন কোরেশী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মন্ত্রীরা এবার আর নির্বাচনের প্রার্থী হননি কেউ। ১৯৯৩ এর নির্বাচনকে সামনে রেখে পাকিস্তানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারটি গঠিত হয় তা'ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার। (মিজানুর রহমান খান, ১৯৯৫ ঃ ১৫) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের অন্তবর্তীকালীন সরকারটি সাংবিধানিক ও আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না, কারণ সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন ধারণা ছিল না। সাহাবুদ্দীন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করার পর তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে রাজনৈতিক এবং দর্শনগত দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে সাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের সরকারটি ছিল প্রকৃত অর্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। কারণ তার সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের কেউ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত এ সরকার একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন উপহার দিয়েছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা করে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভিত্তি, গঠনের কারণ, প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী নিয়ে মত পার্থক্য থাকলেও বিশ্বের প্রায় সবদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি নবীন ও উন্নয়শীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেও অবাধ ও সুষ্ঠু

নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা সাংবিধানিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জুরিসডিকশন তথা ক্ষমতার পরিধি কতটুকু হবে, এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান থাকলেও এ সরকারের কর্মপরিধির কোন সীমাবদ্ধতার নির্দেশ নেই। তাই সেখানে নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচিত সরকারের মতই কার্যক্রম চালাতে পারে। ভারতীয় ইতিহাসে প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট এক রায়ে কেবলমাত্র দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনার শর্ত আরোপ করে। বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী Sir Ivor Jennirgs সর্বপ্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আলোচনা করলেও তিনি এ সরকারের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করেননি বা এ সরকারের দৈনন্দিন প্রশাসন বা নীতিগত বিষয়াদি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। ১৯৭৯ সালের ১০ অক্টোবর ভারতে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ৭ সদস্যের ফুল বেঞ্চ চৌধুরী চরণ সিং এর সরকার সংক্রান্ত ২টি রিট মামলার রায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়। মামলার রায়ে (১০ অক্টোবর, ১৯৭৯) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের একটি সংজ্ঞা প্রদান করা হয়– "Though the constitution itself does not refer to a 'care-taker government' is get it is possible to understand the expression' care-taker government' as the government in power after dissolution of the 'loksabha' and before its reconstitution" (তারেক শামসুর রহমান ঃ ১৪৪)। বাংলাদেশে ১৯৯০ এর গণআন্দোলন শেষে প্রস্তাবিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখা সম্পর্কে ১৫, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের অভিন্ন চারদফা ঘোষণার দ্বিতীয় দফায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা ও কর্মপরিধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ হবেন অর্থাৎ তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক দলের অনুসারী বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন না অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি বা সংসদ সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। তার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোন উপদেষ্টা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না। অন্তবর্তীকালীন এ সরকার শুধুমাত্র প্রশাসনের দৈনন্দিন নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনাসহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন ও নির্বাচন কমিশনের কার্যক্রম ও দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করবেন। অর্থাৎ এ সরকারের মূল দায়িত্বই হবে তিন মাসের মধ্যে একটি সার্বভৌম জাতীয়

সংসদের অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। (বিপুল রঞ্জন নাথ ঃ ৪০০)

উল্লেখ্য, ১৯৯০ এর ৬ ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদের নেতৃত্বে গঠিত সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হলেও সাংবিধানিক দিক থেকে ঐ সরকার তত্ত্বাবধায় সরকার ছিল না। সংবিধানের একাদশ সংশোধনীতেও বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকারকে নির্দলীয় সরকার বলা হয়ছে। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলা হয়নি (মিজানুর রহমান খান, ১৬৫)। তবে রাজনৈতিক এবং দর্শনগত দৃষ্টিকোন থেকে এ সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। মূলতঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার পরিধি সম্পর্কে প্রায় সবদেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এক কথায় আমরা বলতে পারি সাধারণ সরকারের কর্মপরিধি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কর্মপরিধি থেকে ব্যাপক। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ সরকারকে দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থেই কেবলমাত্র কিছু নীতি নির্ধারনের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্রমবিকাশ

১৯৯১ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনটি ছিল নিরপেক্ষ নির্বাচন। এ নির্বাচন প্রমাণ করে যে, সরকার নিরপেক্ষ ও আন্তরিক হলে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। আর সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের উপর। নিম্নে ১৯৯১ সালে ও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পটভূমি আলোচনা করা হলোঃ

প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি

তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের এক সংকটময় পরিস্থিতিতে গঠিত হয়। বাংলাদেশে পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারই গঠিত হয়েছে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো ও দেশের আপামর জনগণের দীর্ঘ আন্দোলন, হরতাল, নিষেধাজ্ঞা, হত্যা ও দেশের কোটি কোটি টাকা অপচয়ের মাধ্যমে। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ একটি নির্বাচিত বৈধ সরকারকে সরিয়ে শক্তির বলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। এরশাদ তার ৮ বছর ৯মাস শাসনামলে একটি গণভোট, একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ২ বার সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করে। কিন্তু

এরশাদের আমলে কোন নির্বাচনই অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। তাই ১৯৮৮ সালে নির্বাচনের পর প্রধান বিরোধী দলগুলো এরশাদ বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের শেষের দিকে এ আন্দোলন তীব্রতর হয়। বিভিন্ন পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবি সংগঠনও এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ব্যাপকভাবে যোগদান করে। বিরোধী দলগুলোর মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট আন্দোলনের লক্ষ্য ও ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা সম্পর্কে ১৯৯০ এর ১৯ নভেম্বর ঘোষনা দেয়। এ ঘোষনায় বলা হয়–

ক. ৮, ৭ ও ৫ দলীয় জোট এরশাদ এর অধীনে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে না। এরা কেবল একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে "সার্বভৌম সংসদ" নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।

খ. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে এরশাদকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে। এরশাদ পদত্যাগের পূর্বে তিনজোটের কাছে গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন এবং এ নতুন উপ-রাষ্ট্রপতির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

গ. উপ-রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে গঠিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার তিন মাসের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে।

ঘ. তত্ত্বাবধায়ক সরকার সার্বভৌম সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং সংসদের কাছে সরকার জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি আপামর জনগণের সমর্থন ও প্রবল গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতাসীন জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর তৎকালীন বিরোধী দল ও জোট সমূহের প্রস্তাবিত "নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক" সরকারের জন্য ঘোষিত রূপরেখা প্রণয়ন করার ঘোষণা দেন। ৬ ডিসেম্বর বিরোধী রাজনীতিকদের নির্দেশমত (তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদের পদত্যাগ, তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দান এবং অতঃপর জেনালের এরশাদ নিজে পদত্যাগ করে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শাহাবুদ্দিন আহমেদকে দায়িত্বগ্রহণের সুযোগ দান) জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতনের পর তিন জোট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার

হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভারগ্রহণ করেন। ফলে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর শাহাবুদ্দিন আহমেদ সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের কথা ঘোষনা করেন এবং সে ব্যাপারে সবার সহযোগিতা কামনা করেন। এরপর তিনি মন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন ১৭জন প্রবীণ, অভিজ্ঞ এবং নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব সমন্বয়ে এক উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করেন। নিম্নে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নাম দেয়া হল ঃ

ক্রঃ নং	নাম	মন্ত্রণালয়
০১।	অধ্যাপক জিল্লুর রহামন সিদ্দিকী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়
০২।	অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দিন আহমদ	জ্বালানী, খনিজ পদার্থ ও পূর্তকর্ম
০৩।	অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা
০৪।	অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য
০৫।	অধ্যাপক ডাঃ এম. এ. মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
০৬।	বিচারপতি এম. এ. খালেক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
০৭।	জনাব কফিল উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ
০৮।	জনাব ফখরুদ্দিন আহমদ	পররাষ্ট্র
০৯।	জনাব আলমগীর এম. এ. কবীর	সমাজ কল্যাণ,মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া
১০।	জনাব এ. কে. এম. মুসা	শিল্প মন্ত্রণালয়
১১।	জনাব ফজলুর রহমান	সেঁচ, পরিবেশ, বন, মৎস ও পশু সম্পদ
১২।	মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	জাহাজ, নৌ চলাচল এবং পর্যটন
১৩।	জনাব এ. বি. এম. জি. কিবরিয়া	যোগাযোগ এবং টেলিযোগাযোগ
১৪।	জনাব ইমাম উদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
১৫।	জনাব বি. কে. দাস	ত্রাণ ও পূনর্বাসন
১৬।	জনাব এম. আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থা
১৭।	জনাব চৌধুরী এম. এ. আমিনুল হক	শ্রম, জনশক্তি এবং আভ্যন্তরীন সম্পদ

(মোজাম্মেল হক ঃ ৩৫৮)

সংক্ষিপ্ত হলেও রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের শাসনকাল ঘটনাবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক। ৮, ৭ ও ৫ দলের পছন্দসই অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিন জোটের অনুরোধে এবং স্বপদে পুনরায় ফিরে যেতে পারবেন এ শর্তে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ তাঁর কার্যকাল দুভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংবিধান অনুযায়ী তিনি ছিলেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধান। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন কার্যকর হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ সাল থেকে। এর ফলে ১৯৯১ সালের ১৯ ডিসেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। শাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসন আমলে দ্বাদশ সংশোধনটি সংবিধানে যুক্ত হয়। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধানে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদের এ নির্বাচন ছিল অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর হতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোট পদের মনোনয়নপত্র জমা দেবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সে সাথে তারা নির্বাচনী কাজের সাথে সাথে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১১/০১/৯১)। নিম্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীর সংখ্যা ও প্রতীকের নাম উল্লেখ করা হ'ল ঃ

ক্রমিক	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিক
০১।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	নৌকা
০২।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	ধানের শীষ
০৩।	জাতীয় পার্টি	২৭২	লাঙল
০৪।	জামায়াতে ইসলামী	২৭২	দাঁড়িপাল্লা
০৫।	জাকের পার্টি	২৫১	গোলাপ ফুল
০৬।	জাসদ (রব)	১৬১	পদ্মফুল
০৭।	জাসদ (ইনু)	৬৮	মশাল
০৮।	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৬২	হ্যারিকেন
০৯।	বাংলাদেশ ফ্রীডম পার্টি	৬৫	কুড়াল
১০।	বাংলাদেশ ইসলামী ঐক্যজোট	৫৮	মিনার

ক্রমিক	রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থীর সংখ্যা	প্রতিক
১১।	জনতা দল	৫০	জাহাজ
১২।	খেলাফত আন্দোলন	৪৩	বটগাছ
১৩।	জাসদ (সিরাজ)	৩১	হাতপাখা
১৪।	ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	হাতুড়ি
১৫।	কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	তারা
১৬।	বাকশাল	৬৮	কাস্তে
১৭।	ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১	কুঁড়েঘর
১৮।	ন্যাপ (ভাসানী)	৩০	লাঠি
১৯।	জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	১৬	গাভী
২০।	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	বাঘ
২১।	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল	১৩	তালা
২২।	গণতান্ত্রিক পার্টি	০৯	কবুতর
২৩।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগ	২৬	চাবি
২৪।	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	নলকুপ
২৫।	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	মোমবাতি
২৬।	গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১১	মই
২৭।	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	ঘোড়া
২৮।	জাতীয় বিপ্লবী পার্টি	০৯	ঘুড়ি
২৯।	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	০৭	চাঁদ
৩০।	জাতীয় যুক্তফ্রন্ট	০৭	দোয়াত-কলম
৩১।	জাতীয় জনতা পার্টি	০৭	হরিণ
৩২।	জাতীয় তাঁতী দল	০৭	চরকা
৩৩।	বাংলাদেশ হিন্দুলীগ	০৬	শঙ্ক
৩৪।	বাংলাদেশ গণপরিষদ	০৬	নোঙ্গর
৩৫।	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল	০১	উট
৩৬।	মুসলীম লীগ (ইউসুফ)	০৮	হ্যারিকেন
৩৭।	মুসলীম লীগ (মতিন)	০৬	হ্যারিকেন
৩৮।	মুসলিম লীগ (আইনুদ্দিন)	০৬	হ্যারিকেন
৩৯।	বাসদ (মাহবুব)	০৬	রিক্শা
৪০।	অন্যান্য রাজনৈতিক দল	৪৯	
৪১।	স্বতন্ত্র	৪২৪	

(উৎস ঃ বাংলাদেশ অবজারভার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১)

উপরোক্ত সারণী পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অসংখ্য রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে এক দিকে যেমন পুরুষ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ৩৭জন মহিলা সদস্যা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৯১ সালের নির্বাচনের সমগ্র ফলাফল ঘোষিত হলে দেখা যায় যে, বি এন পি ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪১টি আসন অপরদিকে আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসন লাভ করে এবং জোট গ্রুপ পায় ১১টি আসন, জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৬টি আসন এবং জামায়াতে ইসলামী পায় ১৮টি আসন। ভোটের হার অনুপাতে বিএনপি ৩১%, আওয়ামী লীগ ২৮%, ও জাতীয় পার্টি পায় ১২%। (বাংলাদেশ টাইমস, ২ মার্চ, ১৯৯১)। এ নির্বাচনে একটি দিক স্পষ্ট যে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সর্বমোট ৭৫টি রাজনৈতিক দল এর মধ্যে ৬৪টি দলের সদস্য কোন আসনেই জয়ী হতে পারেনি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদের ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচনে বি এন পি ২৮টি আসন লাভ করে এবং জামায়াতে ইসলামী লাভ করে ২টি আসন। ফলে বি এন পি'র সর্বমোট আসন সংখ্যা হয়-১৬৯টি এবং জামায়াতে ইসলামী দলের হয় ২০টি। ১৯৯১ এর নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসন চিত্র নিম্নে সারণীর মাধ্যমে দেখানো হ'ল ঃ

ক্রমিক নং	দলের নাম	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
০১।	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১৪১+২৮টি
০২।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৮৮টি
০৩।	জাতীয় পার্টি	৩৫টি
০৪।	জামায়াতে ইসলামী	১৮+২টি
০৫।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি)	০৫টি
০৬।	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ	০৪টি
০৭।	ইসলামী ঐক্যজোট	০১টি
০৮।	ওয়ার্কাস পার্টি	০১টি
০৯।	জাসদ (সিরাজ)	০১টি
১০।	ন্যাপ (মোজাফফর)	০১টি
১১।	গণতন্ত্রী পার্টি	০১টি
১২।	এন ডি পি	০১টি
১৩।	স্বতন্ত্র	০৩টি

(উৎস ঃ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ডঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া, পৃ: ৫৬৩)

উপরের পরিসংখ্যানে সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট ৩৩০টি আসনের বন্টন দেখানো হলো। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বি এন পি সর্বাধিক আসন পাওয়ায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ বি এন পি'কে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু বি এন পি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ না হওয়ায় জামায়াতে ইসলামীর সহায়তায় সরকার গঠন করে এবং তারা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং তার তত্ত্বাবধায়ক সরকার যে অবদান রেখে গেছেন বাংলাদেশের জনগণ তা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে। (মোজাম্মেল হক, ১৯৯৭ঃ পৃ: ৩৬৬)

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পটভূমি

পঞ্চম সংসদের প্রথম থেকেই বিরোধীদলগুলো তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযোজনের জন্য সরকারকে চাপ দিতে থাকে। ১৯৯৩ সালের ২৮ অক্টোবর প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে "অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক" সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা সম্বলিত একটি বিল সংসদে উপস্থাপনের নোটিশ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় পার্টি এবং জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকেও নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব সম্বলিত বিলের নোটিশ সংসদে পেশ করা হয়। সবগুলো বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয় যে, জাতীয় নির্বাচনগুলোকে অবাধ এবং নির্বাচনের সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবমুক্ত করার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংবিধানে সংযোজন করা উচিত। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল বি এন পি এ সব বিল সংসদে উত্থাপনের ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি; বরং বি এন পি সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে নির্বাচন কমিশনকে অধিকতর শক্তিশালী করার মাধ্যমে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের এ যুক্তি ১৯৯৪ সালের ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত মাগুরা-২ উপ নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তসারশূণ্য বলে প্রতীয়মান হয়। উপ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর মাগুরা জেলা ও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়। নির্বাচনী "Code of Conduct" অবজ্ঞা করে প্রধানমন্ত্রীসহ রেকর্ড সংখ্যক মন্ত্রী ও বি এন পি সাংসদ নির্বাচনী প্রচারনায় অংশগ্রহণ করেন। ফলে প্রশাসনকে দলীয় কার্যে ব্যবহারসহ নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস ও কারচুপির অভিযোগ উঠে (Sayfullah Bhuyan and Arun Kumar Goswami, 1998 : 22) । মাগুরা উপ নির্বাচনের

অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বি এন পি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদের প্রধান তিন বিরোধী দল (আ. লীগ, জাপ, জামায়াত) এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে গোষণা করেন যে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে না এবং এরূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল সমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজ পরিচালনা করবেন।

তৃতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধামন্ত্রী নিজে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

চতুর্থত ঃ এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত ঃ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সপ্তমতঃ নির্বাচন কমিশনকে আরো জোরদার করার প্রস্তাবও রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায়। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য

অভিজ্ঞতা বিরোধী দলগুলোর মধ্যে এ আশংকা দৃঢ়মূল করে যে, বি এন পি দলীয় সরকারের অধীনে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।

১৯৯৪ সালের ২৭ জুন সংসদের প্রধান তিন বিরোধী দল (আ. লীগ, জাপ, জামায়াত) এক যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে গোষণা করেন যে, একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যতীত কোন দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে না এবং এরূপরেখা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায় বর্ণিত বিষয়সমূহ ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রথমতঃ একটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার পরিচালনার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী আন্দোলনরত রাজনৈতিক দল সমূহের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এ প্রধানমন্ত্রীই সরকার প্রধান হিসেবে তার কাজ পরিচালনা করবেন।

তৃতীয়ত ঃ অন্তবর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধামন্ত্রী নিজে কোন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না। তিনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না, এমন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করবেন।

চতুর্থত ঃ এ সরকারের মূল দায়িত্ব হবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা।

পঞ্চমত ঃ নির্বাচনের পর সংবিধানের ৫৬নং অনুচ্ছেদের ৩ দফা অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করার সাথে সাথে অন্তবর্তীকালীন সরকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

ষষ্ঠত ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন ছাড়া শুধুমাত্র জরুরী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

সপ্তমতঃ নির্বাচন কমিশনকে আরো জোরদার করার প্রস্তাবও রাখা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রূপরেখায়। এ লক্ষ্যে কমিশনকে পুনর্গঠন এবং এর জন্য

স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া ঃ৫৯৮)।

বিরোধীদলগুলোর কোন দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমুখর করে তোলে। এর পরে ৯ মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সরকার ২১ মার্চ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করে এবং ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাশ হয়। ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিযে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করেন। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বৎসরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয় (মোঃ আব্দুল হালিম ঃ ৩৬২)।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এদেশের ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন কাঠামো তুলে ধরা হল ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রধান উপদেষ্টা :	জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	
ক্রঃ নং	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
০১।	ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ এবং স্থানীয় সরকার
০২।	ডক্টর মোহাম্মদ ইউনসু	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

স্বয়ংসম্পূর্ণ আচরণ বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে একে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় (ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ ভূইয়া ঃ ৫৯৮)।

বিরোধীদলগুলোর কোন দাবীর প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারী ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের ফলাফল বিরোধী দলগুলোকে আরও প্রতিবাদমূখর করে তোলে। এর পরে ৯ মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। সরকার ২১ মার্চ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করে এবং ২৬ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাশ হয়। ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিযে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নিয়োগ প্রদান করেন। এভাবে লাগাতার তিন সপ্তাহের অসহযোগ এবং দুই বৎসরের রাজনৈতিক সংকটের অবসান হয় (মোঃ আব্দুল হালিম ঃ ৩৬২)।

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার

১৯৯৬ সালের ৩ এপ্রিল প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান এদেশের ১০জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দান করেন। নিম্নে হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন কাঠামো তুলে ধরা হল ঃ

তত্ত্বাবধায়ক সরকার

প্রধান উপদেষ্টা :	জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান	
ক্রঃ নং	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
০১।	ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ এবং স্থানীয় সরকার
০২।	ডক্টর মোহাম্মদ ইউনসু	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি

ক্রঃ নং	উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়
০৪।	শেগুফতা বখ্ত চৌধুরী	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৫।	এ. জেড. এম নাছির উদ্দিন	কৃষি, খাদ্য ও ত্রাণ এবং ভূমি, মৎস ও পশু সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়
০৬।	মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়
০৭।	ডক্টর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ	অর্থ মন্ত্রণালয়
০৮।	সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	যোগাযোগ, নৌ পরিবহন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯।	ডক্টর নাজমা চৌধুরী	শ্রম, মহিলা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়
১০।	ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়।

(মোজাম্মেল হক ঃ ৩৮১)

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ ছিল ৮৫দিন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১২ জনু একটি সফল, কারচুপি বিহীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এ নির্বাচনে সর্বমোট ৮১টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ২৭৯জন। মহিলা প্রার্থী ছিলেন ৩৬জন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায় নেন ২৩জুন। এদিন নতুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শপথ নেওয়ার সাথে সাথেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়। (মোজাম্মেল হক ঃ ৩৮৩)

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে জরীপ

"Development Research Partners" নামক এক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী কতিপয় এলাকার এক হাজার লোকের উপর পরবর্তী সব জাতীয় সংসদের নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কে প্রদত্ত মতামত জরীপের ফলাফলে দেখা গেছে যে, উত্তর দাতাদের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ লোক এ জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য

সংবিধানের প্রয়োজনীয় বিধিবিধান করার পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে, কেবলমাত্র শতকরা ৩০.৪ ভাগ লোক বিশ্বাস করেন যে, জনগণের নির্বাচিত যে কোন সরকারের তত্ত্বাবধায়নে অবাধ, সুষ্ঠু ও মোটামুটি সরকারী প্রভাবমুক্ত জাতীয় সংসদের সাধারণ বা সব উপ-নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব। (দৈনিক আজকের কাগজ, ১০০৪, পৃ. ৫-৬) তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে তীব্র আন্দোলনের সময় (১৯৯১) পরিচালিত এ জরিপে জনগণের আকাংখা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমদিকে বি এন পি সরকার তার সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে প্রবল আন্দোলনের মুখে বিএনপি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বিল' মেনে নিতে সম্মত হয় এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল পাশ করে। আবার আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রচারিত অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ব্যাখ্যার সঙ্গে তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত যে মতামত দেয়া হয়েছে এখানে সে অংশটি উদ্ধৃত করা হল-"আমি দীর্ঘদিন যাবৎ বলে আসছি কোন দলীয় সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু, স্বাধীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট প্রয়োগ করতে পারবে না। আমরা বার বার বলেছি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে আগামী তিন/চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে" (দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৯৯৬)। উদ্ধৃতির প্রথম অংশের মনোভাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশবাসীর জন্য হতাশাব্যঞ্জক। এখানে যে দিকটি উত্থাপন করা হয়েছে তা হল, কোন দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। যদি বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এ মনোভাব গ্রহণ করা হয়, তবে সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, কোন রাজনৈতিক দলই দূর্নীতির বাইরে নয় এবং জনগন দুর্নীতিপরায়নদের ভোট দিয়ে গণপ্রতিনিধি নির্বাচতি করেন এবং শাসনাধিকার তাদের উপর ছেড়ে দেন। রাজনৈতিক দলের রাজনীতির আদর্শ হ'য়া উচিত দেশ ও জাতি নির্ভর। যে রাজনীতি দেশবাসীর অবস্থা পরিবর্তনে অক্ষম এবং শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ হাসিলে সচেষ্ট সে রাজনীতিতে জনগনের আস্থা রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, সাংবিধানিকভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠা করেও বার বার অসাংবিধানিক উপায়ে সরকার পদত্যাগের আন্দোলন করে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। আর এ কারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তনের দশ বছর পূর্ণ হলেও আজো আমরা তার সুফল লাভ করতে পারিনি। তাই শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ সুদূর পরাহত।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কিত বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসহ ত্রয়োদশ সংশোধনী আইন

ত্রয়োদশ সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্য হল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। এটি ১৯৯৬ সালের ১ নম্বর আইন। সংশোধনীটি ২৬৮-০ ভোটে পাশ হয়। বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে, ২৬ মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী বিল এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিল পাশ করা হয় যা ২৮ মার্চ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। (জালাল ফিরোজ, ১৯৯৮)

বিষয়বস্তু

এ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ৪র্থ ভাগে "২ক পরিচ্ছেদ ঃ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার" নামক একটি নতুন পরিচ্ছেদ যোগ করা হয় এবং ৫৮ক, ৫৮খ, ৫৮গ, ৫৮ঘ ও ৫৮ঙ নামক নতুন অনুচ্ছেদ সন্নিবেশ করা হয়। তাছাড়া সংবিধানের ৬১, ৯৯, ১২৩, ১৫৭, ১৫২ নং অনুচ্ছেদসহ ৩য় তফসিলের বিধানের সংশোধন করা হয়। (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৬ ঃ ৩৯)

কার্যত ঃ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ঐ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা পালন করবেন। প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন শুধুমাত্র সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে। ঐ মেয়াদে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন

৫৮গ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১১ সদস্যের বেশী হবে না। এর মধ্যে একজন প্রধান উপদেষ্টা এবং অনধিক ১০জন উপদেষ্টা থাকবে। প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়োগ দান করবেন রাষ্ট্রপতি তিনি প্রধান উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করে অন্যান্য উপদেষ্টাদের নিয়োগ দান করবেন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদমর্যাদা ও কার্যাবলী

ক. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রজাতন্ত্রে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের সাহায্য ও সহায়তায় সরকারের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পদন করবেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ব্যতীত এ সরকার কোন নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।

খ. নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষভাবে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনকে যথাযথ সাহায্য এবং সহযোগিতা প্রদান করবেন (বাংলাদেশ সংবিধান, ১৯৯৬ ঃ ৪৩)।

বাংলাদেশে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে। এ দুটি সরকারের গঠনে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, দুই-ই রয়েছে। মূল সাদৃশ্য রয়েছে এদের নির্দলীয় চরিত্রে। মূল বৈসাদৃশ্য রয়েছে এদের সাংবিধানিক পরিচয়ে, যার উৎস ছিল রাষ্ট্রপতি পদ্ধতি ও সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যকার ভিন্নতায়। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ছিল পরিপূর্ণ ঐক্য, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন (জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ১৯৯ ঃ৬)। নিম্নে এ দু' তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তুলনামূলক আলোচনা করা হ'ল।

প্রথমতঃ বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্দোলনরত বিরোধী দল ও জোটগুলোর ঘোষিত যৌথ ঘোষণার ভিত্তিতে। অপর পক্ষে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় সংসদের গৃহীত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। কর্মরত প্রধান বিচারপতি থেকে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কর্তৃক প্রথমে উপ-রাষ্ট্রপতি ও পরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করার ফলে সংবিধানের লংঘন করা হয়, তবে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদানের জন্য পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংবিধানের একাদশ সংশোধনী উত্থাপন ও পাশ করা হয়। এ সংশোধনটি ১০ আগষ্ট ১৯৯১ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে।

দ্বিতীয়ত ঃ বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের সরকার ছিল রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির, কিন্তু বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকার ছিল সংসদীয় পদ্ধতির। প্রথম সরকারের প্রধান ব্যক্তি একই সাথে রাষ্ট্র প্রধান ও সরকার প্রধান, তাই কারো কাছে তার জবাবদিহীতার বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় সরকারের প্রধান ব্যক্তি শুধুমাত্র সরকারের প্রধান। তিন তার উপদেষ্টা পরিষদের সব সদস্যসহ যৌথভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী ছিলেন।

তৃতীয়ত ঃ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিরক্ষাসহ রাষ্ট্রের সব নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করেন। ত্রয়োদশ সংশোধনীর আওতায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনীর কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করায় দ্বিতীয় সরকার এ ক্ষমতা ভোগ করতে পারেনি (তারেক শামসুর রহমান (সম্পা.) ঃ ১৪৪)।

চতুর্থত ঃ প্রথম সরকারকে সাংবিধানিকভাবে "নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার"

আখ্যায়িত করা হয়। দ্বিতীয় সরকারকে সংবিধান "নির্দলীয় সরকার" হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পঞ্চমত ঃ প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সদস্য সংখ্যার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কয়েক দফায় ১৭জন ব্যক্তিকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় সরকারের ক্ষেত্রে একজন প্রধান উপদেষ্টা ও অনধিক ১০জন উপদেষ্টার নির্দিষ্ট বিধান রাখা হয়।

ষষ্ঠত ঃ প্রথম সরকারের নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বড় কোন প্রশ্ন বা অভিযোগের সম্মুখীন হতে হয়নি। দ্বিতীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রথম অবস্থা থেকেই অভিযোগ উঠতে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্ব প্রথম প্রশ্ন তোলে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এমন কেউ কেউ আছে যারা বিগত আন্দোলনের ভিতর ছিলেন না, বরং বি. এন. পিকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করেছেন"।

সপ্তমত ঃ দুই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে অনুষ্ঠিত দুটি সাধারণ নির্বাচনকেই দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকরা সাধারণভাবে সন্তোষজনক মাত্রায় অবাধ ও সুষ্ঠু হিসেবে মূল্যায়িত করেছেন। তবে পরিসংখ্যানের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলার সুযোগ থাকে যে দ্বিতীয় সরকারের আমলে নির্বাচনে বেশী সংখ্যক ভোট কেন্দ্রে সংঘর্ষ ও নির্বাচন স্থগিত হয়েছে এবং নির্বাচন কমিশন ঘোষিত ফলাফলের পর বেশী সংখ্যক আসনের কেন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং নির্বাচনী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার অপেক্ষা দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে বেশী অভিযোগ উঠেছে। অথচ দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে। এসব সন্দেহ ও অভিযোগের কারণ বিশ্লেষন করলে দেখা যায়–১৯৯০ এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়েছিল সর্বসম্মতিক্রমে, কিন্তু দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় বিএনপি সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। আবার দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল পাস করে বি এন পি সরকার। ফলে এ সরকারের সদস্যদের ব্যাপারে আওয়ামীলীগ প্রথমে অভিযোগ তোলে এবং নির্বাচনের ফলাফলের

পরিপ্রেক্ষিতে বি এন পি কারচুপির অভিযোগ আনে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার অভাবই তত্ত্বাবধায়ক সরকার সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যকারিতা ঃ

সরকার একটা বিমূর্ত সংস্থা, যার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয়। সরকারের বৈধতা ও দক্ষতা নির্ভর করে সে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাষ্ট্র বিজ্ঞানী Rodenbaum তার 'Political culture' গ্রন্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে 'Integrated political culture' এবং Fragmanted political culture' এ দু'ভাগে ভাগ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে Low political culture বা Fragmanted political culture হিসেবে ধরা যেতে পারে। এ সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ হ'লঃ-

প্রথমতঃ সংকীর্ণ রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রাধান্য; **দ্বিতীয়তঃ** জাতীয় বিরোধ, সাংবিধানিক সমস্যা, জাতীয় সদস্যার জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত ও প্রচলিত সুষ্ঠু সিভির নিয়মাবলী বা সমঝোতার অভাব। **তৃতীয়তঃ** মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের মতদ্বৈততা বিধায় সমাজ দ্বিধাবিভক্ত; **চতুর্থতঃ** রাজনৈতিক আদর্শের অভাব; **পঞ্চমতঃ** সুষ্ঠু ও সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব; **ষষ্ঠতঃ** পরম সহিষ্ণুতার অভাব ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনীহা (দৈনিক ইনকিলাব ঃ ১৯৯৭)

রাজনীতিতে এসব উপাদান বিদ্যমান থাকায় গণতান্ত্রিক সরকারের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসাবে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেকটি নির্বাচনকে ঘিরেই রয়েছে সন্দেহ, অবিশ্বাস আর অভিযোগ। এসব অবস্থার প্রেক্ষিতেই সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবী ওঠে এবং দীর্ঘ আন্দোলনের পর বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পর পর দুটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যাবলী আলোচনা করে দেখা যায় যে, এ সরকারদ্বয় বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে নির্বাচন সম্পর্কে ব্যাপক আস্থা ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে পারলেও

দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নির্বাচন ঘিরে নানা অভিযোগ রয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। বাংলাদেশের নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে হলে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনই যথেষ্ট নয়। অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবেঃ

প্রথমতঃ নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। কমিশনের স্থায়ী অফিসার থাকতে হবে **দ্বিতীয়তঃ** নির্বাচন কমিশনের প্রধানকে খুবই স্বাধীনচেতা ও বিচক্ষণ হতে হবে **তৃতীয়তঃ** নতুন ও সঠিক ভোটার তালিকা তৈরী করতে হবে। **চতুর্থতঃ** ভোটার আইডি কার্ড প্রচলন করতে হবে **পঞ্চমতঃ** সরকারী অফিসারদের পিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছে **ষষ্ঠতঃ** দেশের বিচার বিভাগকে রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদ করতে হবেএবং এর প্রশাসনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে **সপ্তমতঃ** নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী বিভাগ থেকে মুক্ত করে শক্তিশালী করতে হবে **অষ্টমতঃ** ভোটাধিকার, ভোটদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে **নবমতঃ** রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী আচরণ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে এবং **শেষতঃ** তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনের প্রতিটি স্তরে দক্ষতা, মিতব্যয়ীতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে (এম এ ওয়াজেদ মিয়া ঃ ১৯৯৭)।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে উক্ত কার্য পদ্ধতিগুলো পালন করতে হবে। আর এগুলো কার্যকরী করতে পারলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শুধু তত্ত্বে নয়, বাস্তবরূপ লাভ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে– Al Musud Hasanuzzaman তাঁর "The Role of Opposition in Bangladesh politics" গ্রন্থে বলেছেন, "Though formalizing the care-taker government of Bangladesh has founded an unique example in parliamentary frame work, Constitutional measure of this sort can be followed by similar other developing countries where political culture of trust, democratic norms, values and conventions are yet to take firm roots."

(Al-Masud Hasanuzzaman, 1998 : 193)

উপসংহারঃ

বাংলাদেশে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের' সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, তা এ যাবৎ বিশ্বের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার যাবতীয় উন্নয়নের (নির্বাচনকালীন অন্তবর্তী সরকার প্রশ্নে) মিলিতরূপ। সে দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের 'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি ও সংযোজন হিসেবে মূল্যায়ন করা যায়। গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির সুদৃঢ় বুনিয়াদ, আর এ সংস্কৃতি নির্মান একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এ পথ নির্মানে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক সরকার এককভাবে কোন সফলতা আনতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ যাত্রাপথের একটি শুভ সূচনা করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দুটি সাধারণ নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের প্রশংসা অর্জন করেছে। এতে আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। অবশ্য এজন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আইনগুলো সংশোধন করে জটিলতা মুক্ত করতে হবে, নির্বাচন কমিশনকে এর কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ স্বায়ত্ত শাসিত করতে হবে এবং নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে স্বল্প সময়ে মামলা নিস্পত্তির বিধান করতে হবে। এগুলো নিশ্চিত করা গেলেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানে সফল ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

তথ্য নির্দেশিকা

খান, মিজানুর রহমান (১৯৯৫), ***সংবিধান ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্ক।*** ঢাকা ঃ সিটি প্রকাশনী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৯৬), ***গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*** (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা ঃ গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস।

নাথ, বিপুল রঞ্জন, ***বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিকাশ।*** ঢাকা ঃ বুক সোসাইটি।

ফিরোজ, জালাল (১৯৯৮), ***পার্লামেন্টারি শব্দকোষ।*** ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী।

ভূঁইয়া, ডঃ মোঃ আব্দুল ওদুদ (২০০০), ***বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন।*** ঢাকা ঃ আজিজিয়া বুক ডিপো।

মিয়া, এম. এ. ওয়াজেদ, ***বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান।*** ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী।

রহমান, তারেক শামসুর (সম্পা.), ***বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর।*** ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান (১৯৯১), ***যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারে ছিলাম।*** ঢাকা ঃ আগামী প্রকাশনী।

হক. মোঃ মোজাম্মেল (১৯৯৭), *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি।* ঢাকা।

হালিম, মোঃ আব্দুল, সংবিধান, ***সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি*** *ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।*

দৈনিক আজকের কাগজ (৫-৬/৬/১৯৯৪)

দৈনিক ভোরের কাগজ (১/৩/১৯৯৬)

দৈনিক সংগ্রাম (৩০/৩/১৯৯৬)

Brohi, A. K. (1958), ***Fundamental Law of Pakistan,*** Dhaka.

Bhuyan, Sayefullah & Goswami, Arun Kumar (1998), **"The June 1996 parliamentary Election in Bangladesh** : A Review" *A Journal of Faculty of Social science University of Dhaka (SSR),* Vol. XV, No. 2 : 22.

Hasanuzzaman, Al Masud (1998), ***Role of Opposition in Bangladesh politics,*** Dhaka : UPL

ISSN 1605-2021

LOKPROSHASHON SAMOEEKY
Vol. 18, March 2001, Chaitra 1407

Poverty Alleviation With Special Reference to Adarsha Gram (AG): A Review of the Conditions of Six Adarsha Gram

S. M. Zobayer Enamul Karim

Abstract : This article is an attempt to focus on the poverty scenario of Bangladesh with special reference to the conditions of the inhabitants of six Adarsha Grams (AGs). The article is an outcome of a case study conducted by BPATC. Situations relating to poverty of the allottees of six AGs are highlighted in this article. Demographic characteristics, income and employment condition, standard of life and confidences of the respondents, civic facilities provided by GO & NGOs, development and welfare activities of different departments for the villagers, problems mentioned and suggestion given by the respondent to eliminate poverty have metined and analyzed in this article. For sustainability of AGs, recommendations have also been made in this respect. The mentionable problems identified by the villagers are: scarcity of cultivable land, paucity of capital to operate small business, seasonal unemployment, insufficient calories intake, absence of nearby primary school and lack of formal training, lack of proper housing facilities, insufficient medicare facilities and lack of clothing, scarcity of tubewell, sanitary latrine, kitchen & insufficient loan and less coordination between GO & NGOs.

The analysis depicts that most of the poor and absolutely landless people were considered for becoming the resident of Adarsha Grams, wide variation prevails in the level of education among the villagers, no remarkable steps were taken by the government and non-government organization since the inception of AGs, The villagers of AGs are not in a position to survive on self-help basis, the present system creates the tendency of more dependency on the governmental help, the beneficiaries have an insignificant source of income and employment, average trend of household's income is less than the requirements to meet the subsistence level/basic needs and a very few

---

* ঊর্দ্ধতন গবেষণা কর্মকর্তা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

percent of the loan are being used for income generating activities, which might be the causes of poverty alleviation. It is revealed from the study that government provided homesteads for the landless and rootless for their physical shelter, but no significant efforts was made to get-rid-off poverty of the residents of Adarsha Gram.

Adarsha Gram Project could be a blessing for the landless, rootless, vulnerable, floating and distressed people. It could provide not only shelter to the villagers of AG, but also could create confidence, hopes and aspiration for their lives, it may reduce rural-urban migration if the project is more effective, and cover more rootless/landless rural people. This may have a demonestration effect on nearby villages by encouraging healthy competition among them for better life and experience.

Introduction and Background

Bangladesh is one of poorest countries of the world. It has inherent high rate of population growth, widespread unemployment, mass illiteracy, recurrence of natural disaster like floods, draught and cyclone. These, together with sluggish growth in the national economy has further deteriorated poverty situation. The head-count ratio of poverty is estimated at 43% in 1988-89, which was 44% in 1963-64 (Task Force Report 1990:26). This indicates that poverty coverage in the country remains almost unchanged over last two and a half decades. But absolute number of the poor has increased in the same period. In contrast, poverty incidence has appreciably decreased over the last few decades in our neighboring countries. The head-count ratio of poverty is 23% in Pakistan, 27% in Sri Lanka and 35% in India. Indonesia dramatically reduced this ratio from 58% in 1970 to 17% in 1982 (World Development Report, 1996).

We may now examine the nature, extent, and causes of poverty in rural areas of Bangladesh. The most valid generalization about the poor is that they are disproportionately located in the rural areas (M. P. Todaro, 1992). SO is also in urban areas. According to a BIDS study conducted in 1989-90, 60% of the rural people live below poverty line (Task Force Report 1990 : 104). 25% of the lowest poor people may

be categorized as the "hardcore" poor. Within this "hardcore" poor, there is another underclass of extremely distressed people who represent about 10% of our rural people. In an IFAD report the percentage of rural population below the poverty line in Bangladesh is stated to increasing from 83% in 1965 to 86% in 1988 (IFAD 1992 :3).

Review of Literature Regarding Poverty Scenario of Bangladesh

In 1991-92, as per Household Expenditure Survey (HES), 47.8 percent of the rural people were found below poverty line whose per capita calorie intake was less than 2122 kilo calorie per day and 28.3 percent people belong to the group of absolute poverty line and their calorie intake accounts for less than 1805 K.K.per day. The situation of urban poverty was almost same, i.e., the people living below poverty line and absolute poverty line in urban area were found to be 46.7 and 26.2 percent respectively (Table-1). Bangladesh Bureau of Statistics conducted a survey entitled 'Poverty Monitoring Project' from the beginning of 1994. The findings of the study revealed that in rural Bangladesh 47.6 percent people live below poverty line. In this HES 2250 households from 71 sample areas of 61 districts were covered or incorporated.

According to the 'poverty measurement' survey of Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS), more than 50 percent people of rural areas are poor (51.7%, 1994), which includes about 22.5% as absolute poor (Table-2).[1]

---

1. BIDS : 1987-1994: Dynamics of rural poverty in Bangladesh, April, 1996. (62 districts, 64 unions, 124 villages and 1316 households wre covered for this survey, poverty line was determined on the basiss of intakign per day minimum 2112 k. k. and protein per person. The study reflects that rural poverty reduced to some extent from the end of the eighties (1987) to 1994. Yearly per capita poverty income limit for 1994 including food and non-food items of expenditure was determined Tk. 6,287/- and for absolute poverty this figure was Tk. 3,752/- (current price at 1994). The income limit of 1987 for poverty and absolute poverty was determined by that current year price at Tk. 4,150/- and 2,480 respectively).

Irrespective of urban and rural areas, poverty are expanding. And for urban areas the problems were becoming more and more complex. Though the findings of the study of 1991-92 show that the number of below poverty line was 46.7 percent in urban areas, but the survey on urban poverty of 1995 identified 60.86 and 40.2 percent of the urban households are poor and absolutely poor respectively. The survey also found that, among the poor 90 and 41 percent households have the access to save drinking water and sanitary latrine facilities respectively[2].

The poverty situation over the time (time series) may be understand from the information below:

As per the HES of BBS, the poverty situation slightly improved (Table-1). Number of people belonging to rural poverty group stood 47.8% in 1991-92 compared to 73.8% in 1981-82 and that of absolute poverty accounted for 28.3% as against 52.2% during the same period. Though, it can be noticed that absolute poverty stood to 28.3% in 1991-92 from 22% in 1985-86. Poverty Monitoring Survey of 1995 depicts that the level of rural poverty remain almost

same (47.6%). However, the findings of the same survey of 1994 revealed 44% as poor. It may be re-termed that poverty level increased in 1995. On the contrary, the findings of the study of BIDS shows that rural poverty declined from 57.5% to 51.7% during 1987-1994 and for the same period absolute

---

2. Study of Urban Poverty in Bangladesh, April, 1996. (Planning Commission conducted this survey on 10 cities including Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal, Sylhet, Dinajpur, Tangail, Hazigonj and Pangsha with the assistance of Asian Development Bank. In this Survey to measure poverty; monthly per household poverty income limit including fooding and non-fooding items of expenditure was determined Tk. 3,500/- and for absolute poverty this amounts was Tk. 2500/ (family consisting of 4,36 members). The study revealed that 80% of the respondents of the survey areas seemed themselves poor, whereas the study indicated that 48% of them were poor).

poverty decreased to 22.5% from 25.8%. Poverty limits and poverty gap fell from 21.7% to 19.2% and FGT index gone down from 10.9% to 9.6%[3].

According to the data provided by BBS, till 1991-92 urban poverty counted for 46.7% and the Planning Commission study showed about 61% urban poverty (Ministry of Planning, 1996). Though the several studies regarding poverty situation reveal different pictures, the facts remained that the massive poverty although prevailed althrough in our country. In rural areas, the poor and the absolute poor people are to spend a lion shares of their total income (22% & 27% respectively) for crisis coping like-natural disaster, disease and for other causes (Ministry of Planning, 1996).

Poverty are greatly caused by unequal ownership of land in rural areas and unequal income distribution, scarcity of employment and overall low growth rate both in urban and rural areas. The mentioned study of BIDS shows (where rural poverty counted 51.7%), 10% of the households who belong to maximum income group are the owner of 50.6% of the total land and medium 40% and lowest 10% are the owner of 28% and 2% of the total land. Per capita income disparity of these groups are 31.6%, 35.8% and 15.7% respectively. About 64.7% of the poor people are the owner of only 0.5 acre of land (Ministry of Planning, 1996).

---

3 The BIDS study shows that from 1987 to 1989-90 poverty level became increase from 57.5% to 59.3% and from 1989-90 to 1994 this figure declined to 51.7% from 59.3%. Devastating flood of 1987-88 might be responsible for the poverty situation of 1989-90.

Table 1: Poverty and Absolute Poverty (%) Considering Calore Intake

Poverty level		1981/82	1983/84	1985/86	1988/89	1991/92
Poverty	Rural	73.8	57.0	51.0	48.0	47.8
	Urban	66.0	66.0	56.0	47.6	46.7
Absolute poverty	Rural	52.2	38.0	22.0	28.6	28.3
	Urban	30.7	35.0	19.0	26.4	26.2

Sources : BBS (Statistical Pocket Book, 1997)

- Poverty Level : Per prson per day calorie intake less than 2122
- Absolute poverty : Per person per day calorie intake less than 1805.

Table -2 : Transition of Poverty in Rural Areas (%), 1987-1994 (BIDS)

Index	1987	1989-90	1994
Absolute poverty	25.8	30.7	22.5
Poverty	31.7	28.6	29.2
Poverty and absolute poverty	57.5	59.3	51.7
Poverty gap ratio (%)	21.7	24.8	19.2
FGT ratio	10.9	13.5	9.6

Sources : 1987-1994 : Daynamics of Rural Poverty in Bangladesh, BIDS : April, 1996.

Poverty Alleviation Programs of the Government

Poverty Alleviation a catchy word of the World Bank during the last decade has been adopted by the Bangladesh government as a declared cornerstone of its development efforts. Alleviation of poverty is one of the objectives of the perspective plan (1995-2010) and also of the Fifth Five Year

plan (1997-2002). The Fifth Five Year Plan aims at bringing the poor from the periphery to the center of the development process. One of the major objectives of development policies and aims of the government is economic emancipation by alleviating poverty. To achieve this objective, importance has been given for the implementation of development programs in the concerned sectors of the Fifth Five Year Plan (1997/98-2001/02).

Government actions for rural poverty alleviation include (i) direct, targeted poverty alleviation programs through different Ministries and agencies and (ii) decisions on many policy matters that affect rural development in general and poverty alleviation in particular. Government also recognizes, facilities and involves NGO's in poverty alleviation programs in rural areas.

Overall macro economic development including acceleration of economic growth rate is the key factor of poverty alleviation. Pre condition for poverty alleviation of the poor section of the people and for sustainable development is to increase employment opportunity as well as to enhance per capita income and savings. These lead to explore own economic activities and develop enormous/various social sectors (education, nutrition, health, housing, etc.) and thus improve standard of living. Elimination of unequal land management and utilization of non agricultural sectors in rural areas and creation of employment opportunity, may improve the conditions of the common people. Economic structural adjustment in industries, business and service sectors, control of inflation (specially for non-food items) and augmentation of real income of poor people may play vital role to alleviate poverty.

Keeping in view that to achieve the objectives to generate income and to increase employment opportunity government as well as non-governmental organizations have their own

programs. The government level different ministries and organizations, like: Ministry of Agriculture, Women and Children Affairs Ministry, Bangladesh Rural Development Board (BRDB), Local Government Engineering Directorate (LGED) and Bangladesh Small & Cottage Industries Corporation (BSCIC) lunch the programs. Besides, Food for Works Program (FWP), Vulnerable Group Development (VGD) programs, construction of rural roads/infrastructure/maintenance, etc. Provide employment opportunity for the poor. On the other hand, education extention programs, like : food for education, scholarship and financial assistance for female students, cost free primary education system have reduced educational expense of the poor. Moreover,social awareness about social welfare, women empowerment, child rights are growing which encourage the poor to develop standard of lives and these ultimately may lead to eradicate poverty.

In 1988, the government initiated a clustered village programme with the title of 'Operation Thikana'. The Ministry of Land began the operation rehabilitating the rural rootless people in governmental khas land with a view to creating income generating activities for them in the rural areas so that rural problems can be solved in the rural areas. This is the origin of the project. The 'clustered villages' later on renamed as 'Adarshs Gram'. The proposed research study is in respect of "Adarsha Gram".

Since the inception of the Adarsh Gram Project, it has so far covered about 1000 villages, 30,00 family and more than 2,00,000 people till 1998 (office of the Proicet Dirrector, Adarshs gram, Dhaka 2001). Sustained income generating activities and poverty alleviation programs need to be created for making these villagers self-reliant.

By the end of 1991, indigenous NGOs, the Grammen Bank and the government programs were doing poverty alleviation work in about 35 percent of the 83000 villages of the country

(Lovell, 1992). So the vast majority of the rural people who live in extreme poverty in rural outreaches have to be brought under the umbrella of poverty alleviation programs. But till now, no mentionable progress have been done to improve the standard of living of the villagers or members of Adarsha Gram, either from government initiative or from NGOs; though it was supported by case studies that 90% of beneficiaries of Adarsha Gram belong to poorest in society (GOB, 1992).

This article is the outcome of a case study situations relating to poverty of the allotteses of six Adarsha Grams are highlighted in this article. Demographic characteristics of the respondents, income and employment condition, standard of life and confidenee, civic facilities provided by GO & NGOs, development and welfare activities by various departments for the villagers, problems faced and recommendations given by the respondents to eliminate poverty have highlighted and analyzed in this article. Finally, for sustainbility of Adarsha Grams and alleviate poverty from AG, recommendations have also been made.

DESCRIPTION OF THE SAMPLE ADARSHA GRAMS

Establishment of Adarsha Grams

For this case study a total number of six Adarsha grams were selected from six administrative Division. These grams were Kaliganga of Mankigonj district, Kazirbag of Feni district, Aralia of Bogra district, Joukhali of Bagerhat district, Ahalo of Bhola district and Harnagar of Sunamgonj district. Year of establishment of Adarsha Grams are shown in Table-3

Table 3 : Adarsha Gram by year of Establishment

Sample Grams	Yera of Establishment
Kaliganga	1989-90 (2nd phase)
Kazirbag	1989-90 (2nd phase)

Sample Grams	Yera of Establishment
Aralia	1990-91 (3rd phase)
Joukhali	1989-90 (2nd phase)
Ahalo	1989-90 (2nd phase)
Harnagar	1989-90(2nd phase)

It is observed that out of six Adarsha Grams five were established in the second phase (1989-90) and one in the third phase (1990-91).

B. Status of previous land ownership

It is informed by the officials and respondents that all the land which had been allotted for the households of six grams were government khas land.

C. Process of household selection

All the households of the sample grams were primarily selected by the local Union Parishads and ultimately selected by the prescribed Thana Khas Land and Agriculture Management Committee. Approval of the selection was made by the concerned Deputy Commissioner of the district.

To select the households of the Adarsha Gram some criteria were followed. Those who were absolutely landless, extremely poor, divorced women, widowed, separated women, floating and distressed were given priority to be the residents of the Adarsha Gram.

D. Information about the size of the lands

The sample Grams were covered with total areas of 16.08 acres of land, i.e. average land size of Grams were 2.68 acres. Total homestead land were 8.29 acres i.e., average homestead land per household was only 0.05 acre, no agriculture land was allotted for the dwellers of these gram, 1.20 acres land was given for other purposes like community center, mosque, playground, graveyard, etc.

E. Shape of village and types of land

The researchers found that Kazirbag and Aralia Grams were situated in high land, Kaliganga and Joukhli were situated in between high and low land and Ahalo and Harangar were situated on low land.

Regarding shape of the village it was observed that kaliganga Gram look like a rectangular shape, Joukhali and Aralia Gram were in square shape around ponds, Ahalo and Kazirbag were in simple square shape and Harangar Gram look like a line along a pond.

F. Locational feature of sample AG

It was evident from the observation that average distance of roads from the villages was 1.9 km. and maximum distance of road from Joukhali was 3 km. The average distance of river/canals, hats, markets/bazaars, mosque, primary school, secondary schools, medical and family planning centers from the sample Grams were 2.3, 1.60,. 08, 0.45, 0.60, 2.10 and 11 km. respectively. It was observed that medical centers were located at maximum distance which varied from 5 to 15 km's.

G. Population and number of respondents

Total number of population of six Adarsha Grams was 755 against the 150 respondents,. i.e. the average size of the families were 5.03.

H. Information about ponds, tubeless and Latrines

It was evident from the collected information that average number of ponds for each gram was 0.5. There was no pond in Kaliganga, Kazirbag and Ahalo. For the grams of Aralia, Joukhali and Harnagar only one pond was excavated.

It was observed that in each gram on an average 1.83 tubules were installed and the total number of tubewells were 11. In the Gram, Joukhali there was no tubewell and for this the villagers used to collect drinking water from the neighbouring village.

It was evident from the responses and observation that 18 latrines were installed, out of these more than 70% are now out of order. Though the government documents showed that very household was provided with one latrine. The allottee reported that most of the latrines were installed in the early stage of the village started; but due to lack of maintenance most of them had no existence now.

1. Information about deeds, mutation and participation in earthwork

All the respondents informed that they had received the deeds of the land and documents of mutation and participated in the initial earthwork of the Adarsha Grams.

METHODOLOGY OF THE STUDY

Type of Research, Sample Areas & Size, Data Collection Techniques

This is an evaluative as well as case study type of research. Six selected Adarsha Grams belonging to six divisions (Dhaka, Chittagong, Khulna, Rajshahi, Barisal and Sylhet) were selected as the sample of the study. Out of 159 households settled in those villages, 9 households (5.66%) left the villages and remaining 150 (94.34%) households were living at the time of data collection. Complete counting method were used in this study. Details about the location of Adarsha Grams and number of allotted and respondents for each Grams may be seen in Table-4.

Table-4 : Location of Adarsha Grams

Division	District	Thana	Union	Adarsha Gram	Actual No. of allottes	No. of Respondents (residing now)
Dhaka	Manikgonj	Sadar	Bhararia	Kaligonga	33	30
Chittagong	Feni	Sadar	Kazirbag	Kazirbag	22	20
Rajshahi	Bogra	Sherpur	Bhabanipur	Aralia	45	41

Division	District	Thana	Union	Adarsha Gram	Actual No. of allottes	No. of Respondents (residing now)
Khulna	Bagerhat	Sadar	Khanpur	joukhali	16	16
Barisal	Bhola	Daulatkhan	Sayedpur	Ahalo	18	18
Sylhet	Sunamgonj	Dhirai	Rajanagar	Hranagar	25	25
Total					159	150

All the heads of the households were interviewed with an interview schedule. Besides, three checklists were used to conduct this study. One checklist was used for taking interview of the Assistant Commissioner (land), the second checklist was used to asses impression/opinion of the local people (members of UP, Imam, teacher & others) about the AGs and the third checklist was used for collecting data on socio-economic characteristics of the villages and the basic facilities provided to the villagers. Data collection took place during the period October-November 30, 1999.

FINDINGS

Demographic Characteristics

It was found that most of the respondents (89.34%) belonged to the active age group (21-50 years). 49.34% of the respondents were illiterate. Most of the respondents (80.67%) were married. The respondent's, principal occupation was agriculture/day labour (52.67%) followed by riksha/van pulling (15.33%). Average size of the households was 4.86 which was lower than that of the national figure for Bangladesh (5.15%). Educational qulifications, and Principal occupation of the respondents may be seen in details in Table-5 & 6.

Table-5 : Distribution of the Respondents by Educational Qualifications

Education Qualifications	Number	Percent
Illiterate	74	49.34

Education Qualifications	**Number**	**Percent**
Can Sign Only	44	29.33
Complete Primary	22	14.67
Secondary	8	5.33
Higher Secondary	2	1.33
Total	150	100.00

Table 6 : Principal Occupation of the Respondents

Occupation	**Number**	**Percent**
Agri/day labour	79	52.67
Rickshaw/Van pulling	23	15.33
Small business	16	10.67
Fishing	17	11.33
House work	4	2.66
Service	1	0.67
Carpentry	1	0.67
Painting	1	0.67
Boatman ship	2	1.33
Maid servant ship	3	2.00
Begging	2	1.33
Disability	1	0.67
Total	150	100.00

Previous Living Conditions, Selection Criteria and Land Title of the Respondents

The highest percentage of the respondents, which was 46.67% were previously floating people having no address (Table-7). The selection criteria considered for becoming residents of the Adarsha Gram were floating and absolutely landless (61.33%), extreme poor (17.33%), affected by river erosion

(12.00%) and widowed & divorced (8.67%). None of them faced any problem for taking procession of the houses. 97.33% of the respondents received deed of land title.

Table-7: Previous Living Conditions of the Respondents

Previous Living Conditions	Number	percent
Parents house	21	14.00
Floating	70	46.67
Other's house	59	39.33
Total	150	100.00

Improvement and Extension of the Houses and Basic Facilities Provided

No improvement and extension was done by the government. Majority of the respondents (78%) made no improvement and extension of their houses by themselves. Only 22% made some improvements and extension at their own initiative. The condition of some basic facilities such as kitchen & latrine were not good.

Use of Homestead Land

Most of the respondents did not receive any land in addition to homestead plots. The respondents used their homestead land for kitchen gardening (45.33%), timber tree plantation (32.67%) and fruit tree plantation (39.33%).

Community Life, Health and Family Planning and Other Benefits

It was observed that in every sample village a fair community spirit was developed by sharing their mutual joys and sorrows, and the residents of AGs live in peace without mentionable dispute and unrest. 90.50% of the respondents knew about the remedies of diarrhoea. The member of recipients immunization and family planning method users

were 95.50% and 85% respectively.

All the respondents opined that there was no endeavor to increase knowledge & skill through extending formal training. 85% of the respondents answered that consciousness about protein and calories intake have not been increased. 97.33% made their reaction negative regarding self-sufficiency, though 77.67% respondents answered in the affirmative about the development of self-confidence. Regarding ideas of development process & techniques, participation in decision makings, leadership development, idea of cultural and political process most of the respondents replied in the negative (Table-8 may be seen for details).

Table-8 : Responses of the Villagers about the Benefit Received as Residents of Adarsha Gram

Item	Response	
	Yes	No
Increase Knowledge & Skill	-	100.00
Received training	-	100.00
Receive informal education	2.67	97.33
Increase consciousness about health	65.00	35.00
Increase consciousness about protien knowledge	15.00	85.00
Receive knowledge about the use of pure drinking water	78.00	22.00
Increase the knowledge of using sanitary latrine	50.50	49.50
Consciousness about cleanliness	62.00	38.00
Increase the knowledge for preserving environment	20.00	80.00
Achieve self-sufficiency	2.67	97.33

Item	Response	
	Yes	No
Achieve self-confidence	77.67	22.33
Receive complete idea about the development process and techiniques	-	100.00
More participation in decision making	35.00	65.00
Develop leadership quality	34.33	65.67
Increase consciousness about the cultural/political process	16.33	83.67

Income, Savings and Debt

Most of the respondents (72%) had a monthly income upto Tk. 1700. Average monthly income was Tk. 1347.67. About two thirds (65%) respondents had savings and rest of them (33%) had insignificant saving of Tk. 300; all these savings was in the form of compulsory or force savings as per direction of government organizations and NGOs from where they received loan. More than two-thirds (82%) of the allotees answered that they were drowned into the debt culture and their average debt was found to be Tk. 2875/-. Income and saving-debt pattern of respondents may be seen in Table-9 & 10 respectively.

Table-9 : Statement of Income of the Household

Monthly Income (in Tk.)	Response	Percent
Less than 500	4	2.66
501-800	7	4.67
801-1100	13	8.67
1101-1400	41	27.33
1401-1700	43	28.67

Monthly Income (in Tk.)	Response	Percent
1701-2000	19	12.67
2001-2300	12	8.00
2301-2600	9	6.00
2601-2900	2	1.33
Total	150	100.00

$\overline{X}$= Tk, 1347.67.

Table-10 : Statement of Average Yearly Savings and Debt of the Respondents

	Responsed		Tk. Per Household
	Yes	No	
Savings *	53	97	300/-
	(35.33)	(64.67)	
Debt/loan ++	123	27	2875/-
	(82.00)	(18.00)	

* All the saving were compulsory savings which did not reflect the better condition of the respondents.

A Lions share of the loan was spent to meet the basic needs, though the purpose of the loan was increase their income and employment generation by operating small business and investment. Terms of loan in case of NGOs was weekly repayment of loan at the rate 15% interest. In case of Bangladesh Krishi Bank (BKB) rate of interest was only6%.

More than 97% of the loan takers replied that this loan did not make any significant contribution to improve their economic condition. Table-11 may be seen for details.

Table 11 : Statement of Loan Received, Sources of Loan, Use of Loan, Terms of loan and Effects thereon.

Received Loan	Sources of Loan		Average amount of loan received per family per year	Use of Loan	Terms of Loan	Effects of Loan	
No.	GOs	NGOs				Dev. Condition	Not Dev. Eco. Contition
72 (48.00)	25 (32.05) (BKB)	53 (67.95%) (ASA & BRAC)	Tk. 1,075/-	➢ Build house and maintenance (28.00) ➢ Medicare (22.00) ➢ Fooding (35.00) ➢ Dowry to son-in-law (2.66) ➢ Purchase of Rikshaow (24.00) ➢ Land cultivation (10.33) ➢ Operate small business (41.67) ➢ Cow fattening (2.33) ➢ Meet dya to day households expendi-ture (32.00)	■ Weekly Compulsory payment @2.5% ■ 12.50% rate of interest ■ Weekly savings (ASA) ■ 42 intallment repayment ■ 18.5% rate of interest ■ Weekly saving (BRAC) ■ Collateral deeds of land (BKB)	2.67% These-respondents opined that the loan helped them to operate small scale business, purchase of Riksha/van to increase monthly income & increase savings etc.	97.33%

* Multiple answers were recorded

Development and Welfare Activities

All the respondents i.e., 100% made their opinion that Union, Upazila and Zila parishad did not take initiative in the development process of AGs. Though NGOs and BKB provided loan, but inappropriate supervision and monitoring; the loan did not make any significant contribution to alleviate poverty.

Concerned officials (UNO and AC (land) informed that no significant efforts had yet made by the government agencies and NGOs to change the fate of the villagers and thus to improve economic condition and alleviate poverty. They opined that khas land[4] may be e given to the villagers so the they can cultivate.

Problems Faced and Suggestions Given by the Respondents PROBLEMS

Among the problems faced by the villagers, following may be mentioned:

i) Scarcity of cultivable land, (ii) Scarcity of capital to operate small business, (iii) Seasonal unemployment, (iv) Insufficient calories intake per day (v) Absence of nearby primary school and lack of formal training, (vi) Lack of proper housing facilities, (vii) Lack of clothing and medical facilities (viii) Scarcity of tubewell, sanitary latrine and Kitchen, (ix) Insufficient loan and less coordination between GOs & NGOs 9Table-12 may seen for details).

---

4. Khas land is generally owned by the government, individual person has no right on this type of land.

Table-12 : Information about the Nature of the Obstacles Faced by the Villagers

Natur of Problems	Villagers of AG (N=150)		Local People (N=30)	
	No	%	No	%
Scarcity of required K. calories intake per day	150	100.00	30	100.00
Lack of proper housing facilities	68	45.33	12	40.00
Poor condition of roof and fences of housing	132	88.00	22	73.33
Lack of clothing	138	92.00	25	83.33
Lack of medical facilities	124	89.33	24	80.00
Problems regarding informal education facility	109	72.67	26	86.67
Absence of nearby primary school	89.33	59.33	18	60.00
Lack of capital to operate small business	119	86.00	26	86.67
Lack of opportunity for income generating activities	146	97.33	28	93.33
Scarcity of tubewell and pure drinking water	126	84.00	23	76.67
Seasonal unemployment/unemployment	143	95.33	28	93.33
Lack of bull for plowing	79	52.67	18	60.00
Insufficiency of sanitary latrine	141	94.00	27	90.00
Lack of opportunity of kitchen and Poor condition of kitchen houses	126	84.00	22	73.33
Lack of formal training	139	92.67	27	90.00
Lack of graveyard	102	68.00	19	63.33
Mosque facility	87	58.00	19	63.33
Less coordination between GOs & NGOs	108	72.00	22	73.33
Insufficient Loan	119	86.00	24	80.00

Finally, the respondents provided a number of suggestions to solve the problems (Table-13 may be seen for details). In making recommendations these suggestions have been taken into consideration.

Table-13 : Suggestions to Alleviate Poverty of the Inhabitant of Adarsha Grams

Nature of Problems	No of Respondents			
	Villagers (N=150)		Local People (N=30)	
	No	%	No	%
Provide Credit to operate small business/trade	133	88.67	24	80.00
Allotting cultivable land	129	86.00	21	70.00
Grant Rickshaw/Van for the youngers of the AGs	86	57.33	17	56.67
Allotting more homestead land to every family for kitchen gardening	117	78.00	20	66.67
Minimum one cow (for fattening) and some poultry kids for every family	64	42.66	12	40.00
Income generating/goods/materials items should be provided.	54	36.00	9	30.00
Thana Parisha should take necessary measures to cultivate the ponds for Pisciculture	91	60.67	17	56.67
Provides incountry boats and nets for fishermen	25	16.67	6	20.00
Handicraft materials and training centre should be established	38	25.33	8	26.67
Cooperative activites by the govt. dept. should be strengthen	23	15.33	4	13.33
Separate kitchen for every family	99	66.00	18	60.00

Nature of Problems	No of Respondents			
	Villagers (N=150)		Local People (N=30)	
	No	%	No	%
One Tubewell for every 7 families	94	62.67	17	56.67
One sanitary latrine for each family	120	80.00	13	76.67
Govt. & NGOs should come forward with the programmes to generate income for the villagers	76	50.67	14	46.67
One NGOs should be assigned for each village	42	28.00	8	26.67
Develop housing condition	93	62.00	17	56.67
Repair fencing and roof	95	63.33	16	53.33
Providing primary school nearby the AGs	71	47.33	12	40.00
Providing medical facilities	89	59.33	16	53.33
Provide Mosque and graveyard	92	61.33	18	60.00
Fruit tree plantation in every village	87	58.00	15	50.00
Developing Communication	70	46.67	13	43.33
Electricity supply in AG	112	74.67	20	66.67
Long term loan to cultivate ponds of AGs	83	55.33	16	53.33
Involving income generating activities for the women	43	28.67	8	28.67
Eastablishing Religious institutions to build morality	47	31.33	12	40.00
Provision of ponds for pisciculture in every AG	64	42.67	11	36.67
Introducing Zakat based economy	59	39.33	12	40.00

ANALYSIS OF THE CASE FINDINGS

(i) Demographic Features :

The Table-5 depicts wide variation in the level of education of the villagers. Most of the inhabitants (78.67%) of AGs are illiterate and only 2 persons (1.33%) out of 150 have got higher secondary degree. it was known that no remarkable efforts were made by GOs & NGOs to impart them basic education, though it was stated in the project documents of AG Project that one of the objectives is to facilitate education and literacy. It is recognized by all the social scientists that no efforts of development may be fruitful if the concerned people are not educated properly; in case of these AGs the ideas have become more true.

The Table-6 proves that more than 50% of the villagers are agriculture/day labourer having no cultivable land and about 16% have taken rikshaw/van pulling to be their occupation. This table also reveals that only 10.67% respondents are maintaining their family with small business. The occupation of the respondents are required to be changed for their development. As most of the respondents are landless, their fate may be changed if they can switch over their occupation from agriculture/day labour to small business trade.

(ii) Improvement and Extension of the House :

About the improvement and extension of the houses of villagers it was revealed (Table-7) that no significant efforts was made since its inception by the government and non-government agencies. Only 22% beneficiaries were able to improve to some extent by themselves. Though, it was anticipated that GOs & NGOs would come forward to improve the housing condition of the villagers, but actually that did not happen. It was also noticed that most of the improvement and extension (63.64%) were done to living houses compared

to kitchen and latrines. The above findings reflect the miserable conditions of housing facilities of the villagers which ought to be improved much to meet their basic needs.

(iii) Regarding Self-help and Other Facilities:

Most of the villagers opined that they were not in a position to survive on self-help basis. The existence of group feeding program created the tendency of more dependence of the villagers on the government help. Lack of education, consciousness, training, other development process made them dependent on others.

It was learnt that cooperatives did not make any impact for their economic emancipation. The findings of the study reflect that out of six, in only one AG there was a cooperative society which again was not running properly during the period of the study.

Economic well-being is very much related to employment and income. The beneficiaries had a little source of income and employment. Hence, they are not self-reliant.

It was revealed from the study that most of the government organizations contribute very little to alleviate the poverty which were admitted by the concerned officials. For example, Ministry of Land helped them to allot the government khash land for rehabilitation. The activities of agriculture, livestock, fisheries and other social service departments and BRDB, Grameen Bank could contribute a lot for the villagers to generate income; but these departments did not take any significant role to augment their income.

iv) Employment and Income

Poverty alleviation is closely related to employment and income. One of the objectives of establishing AG is to generate income of the settlers through facilitating employment opportunity. The findings of the study revealed that employ-

ment opportunity is very much limited. Most of the beneficiaries were facing the problem of seasonal unemployment. Majority of them were engaged in agriculture/day-labour which is by nature seasonal work in Bangladesh. It was informed that most of the youth working forces of AGs were unemployed. Self-employment process did not take into reality due to lack of capital and training. Besides, none of the government and non-government organization took initiative to facilitate opportunity of employment proving effective loan/credit etc.

It may also be found from Table-9 that average monthly income of the household of the surveyed villagers was Tk. 1347.67 only and the average trend of household's income is less than the requirements to meet the basic needs. The study shows that average family size was 4.86 and the average per household monthly income was only tk. 1348, it may be returned that per capita monthly income was only tk. 277/- which is quite insignificant to meet their basic needs. It was felt by the researchers that due to lack of employment and income opportunity 9 families left the Adarsha Gram.

v) Savings and Debt:

The study shows that the villagers had no net savings, though it was revealed from Table-10 that 35% allotees had average savings amounting to tk. 300 only, but 82% respondents incurred tk. 2876/- as loan/debt, which shown that they were drowned into loan/debt culture. It may be mentioned here that the saving was forced by nature, as per the direction of NGOs. Because the NGOs did not disburse any loan among the villagers without fulfilling the condition of compulsory saving. Thus, the little saving of the respondents does not reflect the better condition of the villagers.

VI) Loan/Credit and its Uses

The study revealed that 52% of the allottes of the villagers

received loan from Bangladesh Krishi Bank (BKB), Association for Social Advancement (ASA) and Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC). And Average loan per year for each family was only tk. 1,074 (Table-11). The findings also indicated that a small percent of the loan were used for income generation activities which might be the causes of poverty alleviation; a lions share of the loan/credit were used to maintain and meet the basic needs and day to day households expenditure. The conditions of receiving loan for NGOs like ASA and BRAC were very rigid, rate of interest in this cases was considered to be very high. Because of the tied conditions, most of the beneficiaries replied that they became worried how to repay the loan, rather how to use this effectively to improve their economic conditions. Most of the allottees (97.33%) opined that the loan did not make any positive effort to improve their economic conditions.

RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION

RECOMMENDATIONS

The findings and analysis of the study shows that the inhabitant of the Adarsha Gram were living with absolute poverty in terms of income, employment, savings, debt etc. The following recommendations may be considered to alleviate poverty and for sustainability of the Adarsha Grams:

(i) Creation Employment and Income Opportunity

The villagers are living peacefully without mentionalbe disputes and unrest. Apart from these, a congenial atmosphere and a fair community spirit was prevailing among the inhibitions. As they have been provided a permanent house for shelter, now they felt more confident to solve their problems. To alleviate poverty of the inhabitants, prior consideration is to be given to crate employment and income generating activities in each village. Most of the villagers were seasonally unemployed, they are not able to develop self-employment

due to scarcity of capital, required level of education and proper training. A Number of groups in each Adarsha Gram may be formed, following the model of Grammen Bank, BRAC & other NGOs, each group may consists of seven to eight members. GOs and different NGOs may play significant role in this connection. One specific NGO or government service department (cooperatives, social welfare, fisheries, agriculture, livestock etc.) can be assigned in each AG. The attached department of GO or NGO may be given the responsibility to impart training of the group members in different trades.

After accomplishment of formal and informal training the group members may be provided reasonable loan at a very low rate of interest to start income generating activities. Loan should be repaid monthly instead of weekly instatement's. Cow and goat fattening, duck and poultry raising, pisciculture, plantation and horticulture, etc. and other appropriate small business and trades may be undertaken as income generating activities. This processes may also help to reduce the magnitude of the problems of unemployment of the youths of AGs.

Training should be extended for the women in different trades like handicrafts, sewing, etc.-so that they can contribute a significant role to raise the income which ultimately help to uplift their fate. A sewing machine may be given for each group of four to five women.

The development activities of the AGs should be monitored & supervised constantly and this should be a continuous process. The inhabitant should be given advise by the GOs & NGOs. This should be kept in mind that the role of GO & NGOs should be complementary rather than competitive.

(ii) Distribution of Cultivable Land

Most of the villagers knew how to cultivate land. To reduce the dependency only on non-agricultural occupation, culti-

vable Khash land should be distributed among the inhabitants of AG. Those villages where agricultural land are available, agricultural inputs may be provided. Bullocks should be provided to the real farmer for ploughing. This may reduce unemployment situation and may enhance income level of the villagers.

(iii) One Pond in Every Gram

Pisciculture has strong positive correlation with poverty alleviation. Pond may be one of the development inputs. It was found that two-thirds of the Grams have no pond for pisiculture and existing two ponds in two Grams have made no significant efforts to augment the income of the inhabitants. But the proper cultivation of ponds could be one of the major sources of income of the inhabitants. Hence, it is suggested that in the grams where there is no pond, the concerned authority should arrange land and efforts should be made to escavate one pond in each of such Gram.

Concern Thana Fisheries officer may be given the responsibility to arrange cultivation of the pond properly and in this connection Thana Cooperatives department can do a lot to ensure participation of the inhabitants and thus they may feel encouraged with the activities and advantages of cooperatives.

(iv) Provide Basic Facilities

It was found that most of the inhabitants were lacking of basic facilities/which are greatly responsible to increase the productive capacity and thus to get rid of poverty. The villagers did not have adequate access to pure drinking water. Conditions of roof and fences of the houses were deplete. The allotteees had little access to medical facilities. Moreover, most of the Grams have no latrines and the conditions of kitchen and tubewell, etc. were below the standard. In these situation Government may provide one

kitchen and sanitary latrine to each family, one tubewell for every 10 families. For providing medical facilities and improving primary health care and planned family, one health sub-center may be established in each Adarsha Gram. Required tin-sheets may be given to the villagers to mend their houses.

(v) Zakat Based Economy

The fate and conditions of the inhabitants may be improved through establishing Zakat based economy. The well-to-do neighbours of the Grams may come forward with their "Zakat" and may distribute among the allottees of the Grams. This may tremendously reduce the poverty level of the inhabitants of the Grams.

(vi) Ensure Monitoring and Supervisions

Constant monitoring and supervision is required for any sort of development activities. Income generating activities, loan & credit and some basic facilities provided and living condition of the inhabitants etc. must be supervised constantly. Upazila Nirbahi Officer (UNO), Assistant Commissioner (Land) and concerned Land Officials should be given the responsibility to monitor and supervise constantly and to report to the PPMU directly.

There should be an arrangement of seating in every four month with the supervising authority and the inhabitants of Adarsha Gram. The inhabitant may be given the chance to express their problems and possible suggestion to overcome these and the authority should take necessary steps accordingly or may take any other suitable alternatives. This may help to minimize the abject poverty of the inhabitants.

(vii) Motivation Programs

We must acknowledge that self-realization is the pre condition to solve any sort of problem. If the inhabitants really feel

that their fate can not be developed without their self-feeling, i.e., they have to feel, it is not government and other agencies to solve their problems, it is themselves who can be able to remove their inherent problems. In this regard, motivational programs have to be launched by the concerned authority for the inhabitants, so that the villagers do not solely depend on government to solve their problems.

(vii) Other Facilities

Apart from these, graveyard and mosque should be established in every Adarsha Gram.

To ensure smooth mobility of the work force, communication facilities with the nearby highways should be improved.

Conclusion :

Government is trying its best to alleviate poverty of the inhabitants of Adarsha Grams through extending housing, reduction of illiteracy and to some-extent income generation by expanding and providing loan/credit to procure van/ rikshaw etc. The Adarsha Gram project is a blessing for the rootless, floating and distressed and vulnerable people. It has provided not on shelter to the inhabitants, but also has created confidence and hope for their lives. Though inavailability of khas lands for cultivation, has created frustration among the villagers about their fate to survive and sustain in the villages. But at present beyond the existing facilities, nothing more is possible for Government. These efforts may lessen rural-urban migration if the project is made sustainable and covers more rootless/landless rural people. This attempts have created community spirit among the poor. If income generating activities are undertaken by the Government and NGOs through forming groups, the project may be economically viable. Creation of income generation would check leaving tendency of the allottees. It would improve their living condition. This may have a

demonstration effect on nearby villages by encouraging healthy competition among them for a better life. Moreover, allottees may create glaring examples of an ideal village with their community spirit and income generating activities. The residents of Adarsha Grams should endeavour to be more active than ever. Poor man's personal efforts should increase to improve their fortune. Self-help and self employment project should be encouraged from now. Otherwise, poverty alleviation programs will not be a successful program. Self-help is the best help should from now be the program for poverty alleviation as previous program is not fully successful.

References

01. Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS) (1987-1994), ***Dynamics of Rual Poverty in Bangladesh :*** Dhaka (Mimeo).
02. Hossain, Md. Tofazzel and Others, (200), ***"Poverty Alleviation for the Inhabitants of Adarsha Gram : A Case Study",*** BPATC, Dhaka.
03. IFAD (1992) : ***The State of World Rural Poverty,*** New York University Press, P. 3.
04. International Fund for Agricultural Development (1992), ***"The State of World Rural Poverty",*** New York University Press.
05. Level, Catherine H. (1992) ***"Breaking the Cycle of Poverty the IRAC Strategy"*** University Press Limited, Dhaka (P.21).
06. Ministry of Land (1992) : Promotion, Planning and Monitoring Units; Adasha Gram Project, ALA 88/15 (1992),***"Summary of Main Findings of the Nine Sets of Case Studies",*** Dhaka(Mimeo).
07. Ministry of Planning, Planning Commission (1996), ***"Study of Urban Poverty in Bangladesh",*** Dhaka (Mimeo).
08. ***"Report on the Task Forces on Bangladesh Development Strategies"*** (1990). Vol-1., Dhaka (P-26, 104).
09. Today, Michael P. (1992), ***"Economic Development in the Third World",*** 4th Edition, Long man : New York.
10. The World Bank (1996), ***"The World Development Report".***

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

বাংলাদেশে শিক্ষা ও সমাজ কাঠামো ঃ একটি পর্যালোচনা

মোঃ আসাদুজ্জামান *

Education and Social Structure of Bangladesh : A Review

Md. Asaduzzaman

Abstract : Education regarded as a driving force for self development of a human being. It helps both male & female to play an active role in the uninterrupted peace of developmental programs of the country (Asaduzzaman, Nasrin Jahan Jinia 2000 : 147). But the concept of Education is not an independent one. It depends on other social factors of the country. It can play its positive role only when the various components of social structure work infavour of it or work together. So, the concept of Education and social structure is interrelated and interdependent one. The modest attempt of this paper is to examine the relationship between the concept of education and social structure and how the quality of education determine by the various components of the social structure in both developed and developing country with special reference to Bangladesh.

শিক্ষিত মানুষ মানেই দক্ষ মানুষ। উচ্চ শিক্ষিত মানুষ মানে অধিক দক্ষ মানুষ। এ দক্ষতার মধ্য দিয়েই মানুষ অর্জন করে প্রকৃতির মধ্যে প্রকাশ্য ও লুক্কায়িত শক্তি সম্পদ আহরনের বিপুল ক্ষমতা। যত উচ্চ শিক্ষা মানুষ লাভ করে, ততো তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা বেড়ে চলে। ফলে এক লক্ষ মানুষকে উচচ শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রাকৃতিক সামাজিক নিয়ম-নীতি আবিস্কার উদ্ভাবনের সামাজিক পটভূমি নির্মান করতে যে টাকা খরচ হয় একজনের একটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারই তার সহস্রগুন বেশী আয় এনে দিতে পারে (খালেকুজ্জামান ঃ ২০০১ : ১৭০)। ১৯২টি দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্বলিত বিশ্বব্যাংকের ১৯৯৫ সালের দলিলের উদ্বৃতি দিয়ে অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম লিখেছেন, "বিশ্বের মোট সম্পদের বিভিন্ন ধরনের পুঁজির অবদান হলো ভৌতপুঁজি ১৬ শতাংশ, প্রাকৃতিক পুঁজি ২০ শতাংশ এবং মানব

---

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ও সামাজিক পুঁজি ৬৪ শতাংশ। অর্থাৎ যে কোন দেশে সম্পদ সৃষ্টিতে মানব ও সামাজিক পুঁজি গঠনের প্রসারমান বিনিয়োগের তেমন কোন বিকল্প নেই। আর এ মানব সম্পদ গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প খুঁজে পাওয়া যায় না" (শহিদুল ইসলাম : ১৯৯৮)। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষে মানুষে যে সেতুবন্ধন তৈরী হয় তা শুধু জাতীয় পর্যায়ে নয় আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও প্রসারিত হয়। ফলে যথার্থ শিক্ষা ব্যতীত সমাজিক বন্ধন ও সামাজিক ঐক্য, শ্রেণী সচেতনতা এবং, শ্রেণী ঐক্য, জাতীয় ঐক্য কোনটাই যৌক্তিকভাবে বিকশিত হতে পারে না।

শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের বাহক ও ধারক। শিক্ষা সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। সমাজের বিভিন্ন উপাদানের (Elements) মতই শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ অনন্য উপাদান যা সামাজিক অন্যান্য উপাদানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান যেমন শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে তেমনি শিক্ষাও সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় হলো শিক্ষার সাথে সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানের যৌক্তিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ এবং কিভাবে এ সম্পর্ক উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শিক্ষার মান নির্ধারণ করছে সে বিষয়ে আলোকপাত। অধিকন্তু পুরো বিষয়টিকে যৌক্তিকভাবে পর্যালোচনার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ যেমন-শিক্ষা, সমাজ কাঠামো, শিক্ষা ও উন্নয়ন, শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

শিক্ষা (Education)

শিক্ষা মানুষ গড়ার সর্বোত্তম হাতিয়ার। একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন তা দেখেই বুঝা যায় আগামী দিনে দেশটির উন্নয়ন কেমন হবে। চীন দেশর সেই বিখ্যাত প্রবাদটি "তুমি যদি শত বছরের পরিকল্পনা কর, তবে গাছ লাগাও; আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাকো, তাহলে মানুষ তৈরী করো।" আক্ষরিক দিক হতে শিক্ষা কথাটির অর্থ বাড়নে সাহায্য করণ,লালন পালন করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি (আসাদুজ্জামান ঃ নাসরীন জাহান জিনিয়া ঃ ২০০০ ১৫৩)।

অধ্যাপক লুৎফুল হক চৌধুরী শিক্ষা ধারণাটির চমকপ্রদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উন্নয়ন এবং সমাজ পরিবর্তনের ধারক হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন এভাবে... "Development and social change can best be achieved

by giving prominence to men and human resources rather than things...education and training are considered to be the most effective instruments for modification of the content of men's minds and for reconstituting and developing a society. Education is the master determinant of all aspects of change and development. Education can endow people with knowledge, training, spirit of initiative and social responsibility which will enable them to cope efficiently, imaginatively and creatively with the problems of change and development. Education is the key that unlocks the door to development and modernization." (Chowdhury, Lutful Haq : 1978 : 93).

The world book of Encyclopedia এর মধ্যে শিক্ষাকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে-

"Education is the process by which people acquire knowledge, skills, habits, values and attitudes. ...education is also used to describe the results of the educational process. Education should help them develop on appreciation of their cultural heritage" (The world book of Encyclopedia : Vol. E, p-84).

কেউ কেউ শিক্ষাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন- "Education is the process of increasing knowledge, skill and capacity and creating a positive attitude of the people in a society. In economic terms, it means accumulation of human capital and its effective utilization for development of the economy. Development of human resources enriches the total life itself in its social, cultural and political dimensions (Rahman, Khandaker Mahmudur : 1996 : 499)". Adam Smith তাঁর বিখ্যাত বই The Wealth of Nations-এ শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন, ... 'fixed capital' includes "the acquired and useful abilities of all the inhabitants or members of the society (quoted from Chowdhury, Lutful Haq : 1978: 96). Alfred Marshal শিক্ষা খাতে ব্যয়কে জাতীয় বিনিয়োগ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে, "The most valuable of all capital is that invested in human beings" (Quoted from Chowdhury, Lutful Haq : 1978 : 97)

Swift এর ভাষায়, "education as to maintain and change society at the same time" (Swift : 1970 : 217)

Sukla শিক্ষা প্রত্যয়টিকে নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, "education generated social change by

a) Changing the values and aspirations of the participants;

b) Changing opportunity structure; and

c) Introducing knowledge and skills of communication" (Sukla : 1963 : 22).

বাংলাদেশের বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা ও শিক্ষার গুরুত্বকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

First Five Year Plan (1973-78)

Education must be responsive to the specific requirements of the nations. It must have relevance to future work and life, and must provide adequate preparation for productive employment. Education must be able to enrich the cultural attainments of the people. (FFYP : 1973)

Second Five Year Plan (1980-85)

Superior input of human efforts is by far the most important determinants of all development. Development of capabilities of man through education and training is crucial to any development effort. The SFYP aims at the development of a low-cost functional education by linking different levels of education with production process as far as possible (SFYP : 1980)

Third Five Year Plan (1985-90)

Education is one of the basic needs for developing human capabilities. The objective of TFYP was to enroll 70% of the primary age-group children by 1990 and to reduce the rural-urban gap in education facilities. it also aims to give emphasis on science, technical and vocational education. (TFYP : 1985)

Fourth Five Year Plan (1990-95)

In any economy, education is a matter of paramount national importance. it is More so in a less developed country like Bangladesh where a comprehensive base of mass literacy, a strong foundation of ethical values conducive to intellectual and material integrity in society, a high quality standard education backed by a dynamic R & D system to promote productivity of labor and management and to enhance the country's resource base on a continuous basis should partially make up the deficiency of capital. Both at individual and national levels, education is an item of consumption, a form of investment and an avenue of employment. The objectives of FFYP was to introduce compulsory primary education, to reduce mass illiteracy, to enlarge and upgrade the base of science education at all levels and to inculcate moral values in society. (FFYP : 1990)

বস্তুত : মানুষকে মানুষ হিসেবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। মানুষ ছাড়া সকল প্রাণীই প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়। এজন্যে তাদেরকে কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। অথচ মানুষকে জ্ঞান সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য একটি পরিকল্পিত কৃত্রিম কার্যকরী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়। প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মায় না। জীব জগতের অনান্য শিশুর মত মানব শিশুও অবোধ ও অবুঝ হয়ে জন্মায়। তার মা-বাবা, আত্মীয় স্বজন, সমাজ ও পরিবেশ ইত্যাদি তাকে হিতাহিত জ্ঞানের উন্মেষে সাহায্য করে। তাকে মানুষ ও পশুর মধ্যকার পার্থক্যগুলো শেখায়। একমাত্র মানুষই হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সংঘবদ্ধ জীব। শিক্ষাই মানুষকে ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্যের পার্থক্য শেখায়। প্রত্যেক মানুষই তিনটি সত্তার সমন্বয়। দেহ, মন ও আত্মা এ তিনটি সত্তার সমন্বয়ে একজন মানুষের অস্তিত্ব। মানব শিশুর জন্মের পর থেকে ক্রমাগত ও অব্যাহত পরিচর্যার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশঘটে। নানা সামাজিক প্রক্রিয়ায় তার মন বেড়ে উঠে। আর আত্মার শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ভর করে নৈতিকতার পরিগঠনের উপর। মহাকবি মিল্টন বলেন- "Education is the harmonious development of body, mind and soul" অর্থাৎ দেহ, মন ও আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই শিক্ষা।

শিক্ষা ও উন্নয়ন

শিক্ষা যেহেতু এক ধরনের পুঁজি, তাই এর সুষম বন্টন সামাজিক কল্যাণ বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষা শুধু যে উৎপাদনমুখী এক বিনিয়োগ তাই নয়, সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ (তিলক ঃ ১৯৮৭ : ৬৮)। শিক্ষা এবং উন্নয়ন উভয়ের মূল লক্ষ্য ব্যক্তি ও সমাজের কাঙ্খিত পরিবর্তন। ব্যক্তি ও প্রজন্মের মনে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মূল্যবোধ, মনোভাব ও ব্যবহারের কাঙ্খিত ধারায় নিয়ে যাবার প্রক্রিয়াই শিক্ষণ (দেবিয়ার: ১৯৮১)। উন্নয়ন ভাবনায় ও প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বি, আই, ডি, এস এর একটি সমীক্ষায় শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Education contributes to the empowerment of the poor and thereby enhance their capacity to resist exploitation and achieve their rightful bargains in all economic transaction. Secondly, education can facilitate access to more remunerative employment opportunities. A caveat here, however, is that while primary education is seen to carry a generally empowering function, the specific type of education received beyond the primary level in Bangladesh render any on job application rather difficult. This implies a low correspondence between education and labour productivity. The benefits of secondary education and beyond for poor households come only in the distorted form of individual escapes into white-collar employment rather than through productivity increases in existing wage and self-employment avenues. The low correspondence between secondary education and productivity also means that drop-out from this level become a liability for society...The bulk of the poor are those without any formal schooling....55% of all poor and 60% of the hard-core poor" (Rahman and Hussain : 1992 : 2000).

যদি উন্নয়নকে প্রবৃদ্ধি, সাম্য ও জীবনের মান এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় তাহলেও শিক্ষা উন্নয়নে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে। মানুষের গড়পড়তা আয়ু, শিশু মৃত্যুর হার, স্বাস্থ্য সুবিধের উপর অধিকার এমনতরো সীমিত লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ সীমাবদ্ধ রাখলেও এসব অর্জনে শিক্ষার অবদান খাটো করে দেখার উপায় নেই (রহমান, আতিউর: ১৯৯৪ :

৩৯)। বস্তুতঃ উন্নয়নের এসব লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা আরো সুনির্দিষ্ট কিছু অবদান রাখতে পারে :

১) জনশক্তি চাহিদা মেটানোর জন্য দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ করার ক্ষেত্রে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর এ ভূমিকার মাধ্যমেই শিক্ষা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২) সার্বজনীন শিক্ষার মাধ্যমে আয়ের বৈষম্য দূর করে বেশী সংখ্যক মানুষকে প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে শিক্ষা সাহায্য করতে পারে।

৩) শিক্ষা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিতে পারে এবং জীবনের মান বাড়াতে সাহায্য করতে পারে। স্ব-উন্নয়নের প্রতি এক ধরনের গর্ববোধ তৈরী করতে পারে শিক্ষা। শিশুকাল থেকে জীবন চলার নানা সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত রাখা এবং পরিবর্তনশীল এ বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলার মন ও মানসিকতা তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে (রহমান, আতিউর : ১৯৯৩ : ৩৯)।

শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যয় দুটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে (যেমন সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়ন) শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আবার শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করতে সামাজিক উপাদানগুলোর যৌক্তিক আন্ত: সম্পর্ক এবং ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন একান্ত অপরিহার্য।

শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান

কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখছে তা শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানের উপর নির্ভর করে। শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান কেমন তা দেখলেই দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বা উন্নত সে সম্পর্কে বোঝা যায়।

শিক্ষার পরিমাণগত মান

শিক্ষার পরিমাণগত মান বলতে একটা দেশ শিক্ষায় কতটুকু দক্ষতা অর্জন করেছে, কতজন শিক্ষার্থী শিক্ষায় অংশ নিচ্ছে, কতজন ভর্তি হলো, কতজন ঝরে পড়লো, পুনরাবর্তন বা Repeatation কেমন তাকে বোঝায়। যেমন- বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে সর্বমোট Dropout ও output rate (%) ছিল-

Rate (%)	Girls	Boys	Total
Total Drop out	65.9	57.6	60.5
Total output	34.1	42.4	39.5

Source : Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS)-1991.

শিক্ষার গুণগত মান

শিক্ষার গুণগত মান বলতে বুঝায়, কোন একটা দেশের শিক্ষার্থীদের ফলাফল যেমন-জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, অভ্যাস-এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গুণগত দক্ষতা বা মান বিচার করা যায়।

যেমন- বাংলাদেশে 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট-এ ১৯৮৮-এ বলা হয়েছে- "শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখি জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা, এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরী করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ন জনশক্তি তৈরী করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়" (বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট : ১৯৮৮)।

কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ সকল গুণাবলী সঠিকভাবে অর্জিত হচ্ছে না। যেটুকু দক্ষতা অর্জিত হচ্ছে তাতে গ্রামের ও শহরের স্কুলের ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। আবার মেয়েদের Dropout rate বেশী বলে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা শিক্ষায় অনগ্রসর। ছেলেদের দক্ষতা মেয়েদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশী। আবার গরীব বা অনুন্নত দেশে উন্নত দেশের তুলনায় Dropout ও Wastage বেশী হওয়ার কারণে শিক্ষার গুণগত মানও ভাল নয়।

শিক্ষার গুণগত মান নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর যেমন-

ক. Inputঃ শ্রেণীকক্ষের অবস্থা : ছাত্র-ছাত্রী খুব কম বা খুব বেশী হলে অসুবিধা হয়।

শিক্ষকের যোগ্যতা : শিক্ষকের যোগ্যতা ভাল হলে শিক্ষার্থীরাও লাভবান হয়।

শিক্ষা উপকরণ: বই, পুস্তক, আসবাবপত্র ইত্যাদির উপর শিক্ষার গুণগত মান

নির্ভর করে। বিদ্যালয়ে অবস্থান কাল-কত সময় ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে অতিবাহিত করছে, যেমন-আমাদের দেশে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত (I-XII) ১২ বছর।

খ. **Output :** শিক্ষার কতটুকু উন্নয়ন হলো, কতজন ভাল রেজাল্ট করেছে, দক্ষতা কেমন বেড়েছে, Wastage কেমন তা নিয়ে গুণগত মান বিচার করা হয়।

গ. **Outcome :** বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে শিক্ষার্থী সমাজে, অর্থনীতিতে কতটুকু সক্রিয়, কতটুকু দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারছে তা শিক্ষার গুণগত মান। এটা শিক্ষার বাহ্যিক দক্ষতা।

সমাজ কাঠামো

কোন মূল বস্তুর গঠনকারী উপাদান, উপাদনগুলোর বিশেষ সংযোজন বা বিন্যাস এবং সেগুলোর ভূমিকা তথা কার্যকারিতা মিলে ঐ বস্তুর কাঠামো গড়ে উঠে। সমাজ প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় মূর্ত নয় যে, একে আক্ষরিক অর্থে চোখে দেখা বা স্পর্শ করা যাবে। সমাজ একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। তবে প্রাকৃতিক বস্তুর ন্যায় সমাজ কাঠামো বলতে সমাজের যে সব উপাদানের দ্বারা সৃষ্টি এবং উপাদানগুলো যেভাবে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে কাজ করে তার এক বিশেষ ব্যবস্থাকে বোঝায়। ব্যক্তিকে নিয়েই মানব সমাজ বা সামাজিক গোষ্ঠী। অতএব, সমাজ কাঠামো বলতে আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক বা ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ককে বোঝায়। এ সব সম্পর্ক সমাজের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাই মানব সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী এবং প্রতিষ্ঠান নিয়ে। এগুলোর প্রত্যেকটি যখন মিলিত হয়ে স্ব-স্ব ভূমিকা পালনার্থে একটি সু-শৃঙ্খল ব্যবস্থার সৃষ্টি করে তখনই গড়ে উঠে সমাজ কাঠামো। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজ যেমন একটি বিমূর্ত অথচ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সমাজ কাঠামোও তেমনি একটি বিমূর্ত অথচ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক প্রত্যয়। সমাজের যেমন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না, সমাজ কাঠামোরও তেমনি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞান এবং সমাজ নৃবিজ্ঞানী সমাজ কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু সমাজ কাঠামো সম্পর্কে তাদের মতামতে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা সবাই সমাজ কাঠামো প্রত্যয়টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ঐ প্রত্যয়ের এক একটি বিশেষ দিকের উপর দৃষ্টি নিবন্ধন করেছেন। কোন

সংজ্ঞায় সমাজ কাঠামোর সামগ্রিক রূপ নিয়ে বর্ণনা বিস্তারিত করা হয়নি। সমাজ কাঠামো হচ্ছে সমাজের সাংগঠনিক অখন্ড সত্ত্বা। অথচ তাকে খন্ড খন্ড করে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কোন বিশেষ সংজ্ঞা আবার সব সমাজের বেলায় প্রযোজ্য নয়। নিম্নে আমরা সমাজকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

Bottomore বলেন যে, "অধিকাংশ লেখক মূলতঃ সমাজ কাঠামো বলতে সমাজে ঐ "কাঠামোগত রূপকেই বুঝিয়ে থাকেন" (বাটোমোর টম ঃ ১৯৯২-১২৩)।

সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Maclver এবং Page তাদের Society নামক গ্রন্থে বলেন, "In the analysis of social structure the role of the diverge attitudes and interests of social beings is revealed" (Maciver and page : 1952 :30) । দেখা যায় যে, Maclver এবং Page বস্তুতঃ ভূমিকার উপরই জোর দিচ্ছেন এবং এ ভূমিকা যে ব্যক্তির স্বার্থ ও মনোভাবের সংগে সম্পর্কযুক্ত তারা তা উপেক্ষা করেননি।

Moris Ginsberg সমাজ কাঠামোর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "Social structure is the complex of the principal groups and institutions which constitute society" (Ginsberg : 1934 : 50)

এখানে তিনি সমাজের প্রধান প্রধান সামাজিক গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের যৌগিক সমন্বয়কে সমাজ কাঠামো বলে আখ্যায়িত করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজ বিজ্ঞানীরা এই সংজ্ঞাটিকে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। Bottomore এটাকে "Most usefull" বলে ব্যাখ্যা করেন। সেন বলেন, সংজ্ঞাটি অধিকতর বাস্তবসম্মত। Ginsberg এর এ সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, সমাজ কাঠামো হলো সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠানের জটিল রূপ। আর এই দল ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ কাঠামোর প্রধান উপাদান।

সমাজ কাঠামোর প্রধান উপাদান

(১) প্রধান প্রধান দল গোষ্ঠী এবং

(২) প্রতিষ্ঠানসমূহ।

(১) প্রধান প্রধান দল/গোষ্ঠী

প্রধান প্রধান দল বা গোষ্ঠী এমন এক জনসমষ্টি যার সদস্যদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আগ্রহ, স্বার্থ, মোটামুটি এক বা অভিন্ন। যেমন-পরিবার।

লক্ষ্য ও প্রকৃতি অনুসারে দলকে দু' ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-

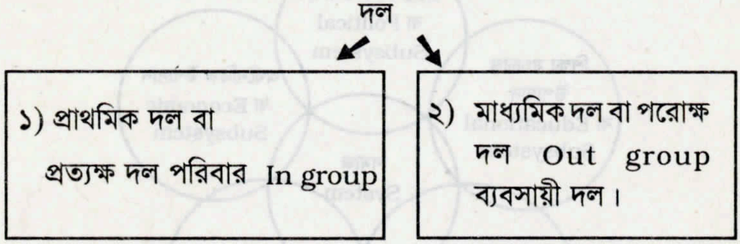

(২) প্রতিষ্ঠানসমূহ

প্রতিষ্ঠান বলতে বোঝায় এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সমাজ তার কার্য সম্পাদন করে। বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা সমাজে বিদ্যমান। এ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ হয়। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এ সকল বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন- (১) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (২) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (৩) সামাজিক প্রতিষ্ঠান (৪) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (৫) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও (৬) শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান ও শিক্ষা : আন্ত:সম্পর্ক

সামাজিক কাঠামো ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কোন দেশের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সামাজিক কাঠামোগত সুসামঞ্জস্যের তাৎপর্য অনেক বেশী। সমাজ মূলতঃ একটা ব্যবস্থা বা System। সমাজের সদস্য হিসেবে এ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি। একটি ব্যবস্থা হিসেবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ উপাদান বা Sub-systems নিয়ে সমাজ গঠিত। এ উপাদানগুলোর মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক বিন্যাসই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আছে সমাজ কাঠামো। সমাজের প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে সমাজ কাঠামো গড়ে উঠে যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। সমাজের এ সকল প্রধান প্রধান দল ও প্রতিষ্ঠান সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন Sub-systems গুলোকে দেখানো হলোঃ

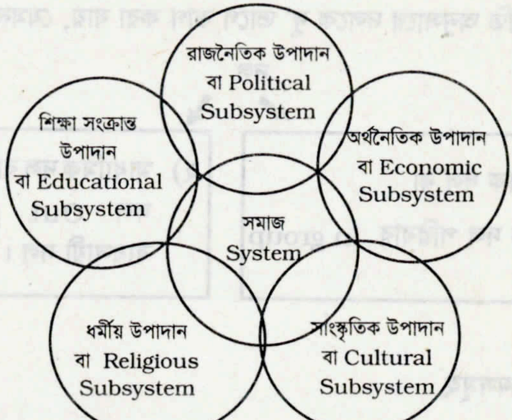

সামাজিক উপ-কাঠামো

সামাজিক কাঠামোর উপদান হিসেবে-রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-রাষ্ট্র, সরকার, সংগঠন, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি। অর্থনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-সম্পত্তি, অর্থ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বাজার ব্যবস্থা, ভোগ, শিল্পপতি, ভূ-স্বামী, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, কৃষি, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। ধর্মীয় দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার, অনুশাসন।

শিক্ষা সংক্রান্ত দল ও প্রতিষ্ঠানে আছে-শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, লিখন-শিক্ষা, পরীক্ষা প্রথা, শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ইত্যাদি।

সমজের এ সকল দল ও প্রতিষ্ঠান পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের সাথে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। এসব উপাদানগুলো পরস্পর পরস্পরকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যা নিম্নের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো ঃ

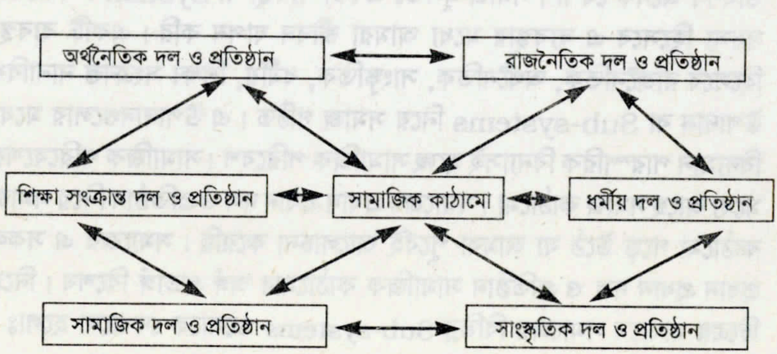

বস্তুতঃ সামাজিক কাঠামোর এ সকল উপাদানের সমাবেশই হচ্ছে সামাজিক পরিবেশ। এ সকল উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সামাজিক কাঠামোর গতি-প্রকৃতি গড়ে উঠে (আব্দুল মালেক, ১৯৯৩)।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানসমূহের সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্ক আলোচনা ঃ

রাজনৈতিক উপাদান ও শিক্ষা

সামাজিক কাঠামোর অন্যতম উপাদান হিসেবে রাজনৈতিক উপাদান সমাজ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজের অন্যান্য অংশের ক্রিয়া রাজনৈতিক উপাদানের ক্রিয়া দ্বারা প্রধানত নিয়ন্ত্রিত হয়। এ দিক দিয়ে বলা চলে, সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক উপাদানের প্রধান দিক হিসেবে রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, বিচার ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির ক্রিয়া একটা দেশের গোটা সামাজিক পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। একটি রাষ্ট্র কতটুকু গতানুগতিক বা আধুনিক, কতটুকু গণতান্ত্রিক বা রাজতান্ত্রিক ইত্যাদির উপর সেই রাষ্ট্রের সামাজিক পরিবেশ নির্ভর করে। সরকারও রাষ্ট্র যদি যৌক্তিক ক্রিয়ার অধিকারী না হয় তবে সে দেশের সংবিধান,নির্বাচন, আমলাতন্ত্র ইত্যাদিও যৌক্তিক চরিত্রের অধিকারী হয় না।

একটা দেশের শিক্ষার ফলাফল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও দেশের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিভিন্ন রকম। বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার উপর বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আছে। রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের উপর শিক্ষার ভিত্তি নির্ভর করে। রাজনৈতিক উপাদান বা বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উপাদানের মতো শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

পৃথিবীতে আমরা কয়েক ধরনের রাষ্ট্র দেখতে পাই। যেমন-

১. উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
২. উন্নয়নশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
৩. স্বল্পোন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
৪. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।
৫. রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সাধারণত ঃ আমরা উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সাথে শিক্ষার সম্পর্ক দেখতে পাই। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের উন্নত রাজনৈতিক অবস্থা শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক। কিন্তু স্বল্পোন্নত ও রাজতান্ত্রিক দেশের অযৌক্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা শিক্ষার ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যেমন-উন্নত দেশের রাষ্ট্রে স্বচ্ছ জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা রয়েছে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কম, সরকার জনগণ দ্বারা নির্বাচিত, সংবিধান প্রণয়নে জনগণের স্বার্থ রক্ষা, সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'য়া, বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ এবং প্রশাসনের হস্তক্ষেপ নেই, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক ও সেবাধর্মী ফলে এ সব দেশের শিক্ষার হার অনেক বেশী। উন্নয়নশীল দেশে স্বচ্ছ জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা তুলনামূলকভাবে কম, প্রায় সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। আবার স্বল্পোন্নত দেশসমূহে জবাবদিহিতা ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা অনেক কম, তত্ত্বগতভাবে জনগণের স্বার্থের কথা থাকলেও বাস্তবে এর অনুশীলন নেই, ব্যক্তিস্বার্থে সংবিধান পরিচালিত হয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়না, বিচার ব্যবস্থায় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা দেখা দেয়, আমলাতন্ত্র অযৌক্তিক, দুর্নীতি, কেন্দ্রীকতা, ধীরগতি সম্পন্ন, সেবাধর্মী নয় ফলে এসব দেশে শিক্ষার হার কম।

অর্থনৈতিক উপাদান ও শিক্ষা

কোন দেশের শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উপাদানের ভূমিকার ন্যায় অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বলা চলে কোন দেশের শিক্ষার বাস্তব শর্তই নিহিত থাকে সে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। একথা সত্য যে, গতিশীল ও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনা। একথাও সত্য যে, গতিশীল ও শক্তিশীল অর্থনৈতিক ভিত্তি ছাড়া আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে না। অর্থনীতিবিদের মতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষার সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেশী হলে স্বাক্ষরতার হারও বেশী হয়।

চিরায়ত অর্থনীতিবিদ যেমন এডামস্মিথ, রিকার্ডো, মার্শাল, ফিশার যাদের তত্ত্ব দীর্ঘদিন ধরে মৌলিকতত্ত্ব হিসেবে চলে আসছে তাঁরা সবাই শিক্ষার সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যে ইতিবাচক সম্পর্ক আছে তার উপর আলোকপাত করেছেন। তাঁদের মতে "শিক্ষা এমন একটি ক্ষেত্র যার লক্ষ্য দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে পুঁজির সঞ্চায়ন ঘটানো।" শিক্ষা মানব পুঁজির প্রসার ঘটিয়ে বস্তুগত ও

অবস্তুগত পুঁজির সঞ্চায়ন ঘটায়। আধুনিক কালের অর্থনীতিবিদ যেমন-থিওডর শুলজ, জন ডেইজী, আর্থার লিউইস, রিচার্ড হারবিসন, জন ইয়ারর্স, জিন বোম্যান, আরনল্ড এন্ডারসন, প্রিসলী-প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করেছেন যে, "শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োজিত অর্থ ও সম্পদের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে জাতীয় অর্থনীতি বিশেষভাবে লাভবান হয়"। তারা শিক্ষার সাথে অর্থনীতির যে ইতিবাচক সম্পর্ক আছে গবেষণার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। সবাই একমত যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে যত সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় জাতীয় অর্থনীতিও তত বেশী লাভবান হয়।

এ সকল গবেষণার ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা খাতে ৭% বিনিয়োগ করার জন্য UNESCO সুপারিশ করে। অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতেমাত্র ২% বিনিয়োগ করা হয়।

শিক্ষা সমাজে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবে শিক্ষা প্রসারের জন্য শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি দরকার। শিক্ষার গুণগত মান বাড়বে না যদি অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় না হয়। "অর্থনৈতিক চক্র যত বেশী জোরদার হবে তত বেশী মানব পুঁজী দরকার হবে, তত শিক্ষার চাহিদা ও মান বাড়বে। উন্নত দেশে এই অর্থনৈতিক চক্র দ্রুত ঘুরছেস্বস্ব (মালেক আব্দুল ঃ ১৯৯৩)

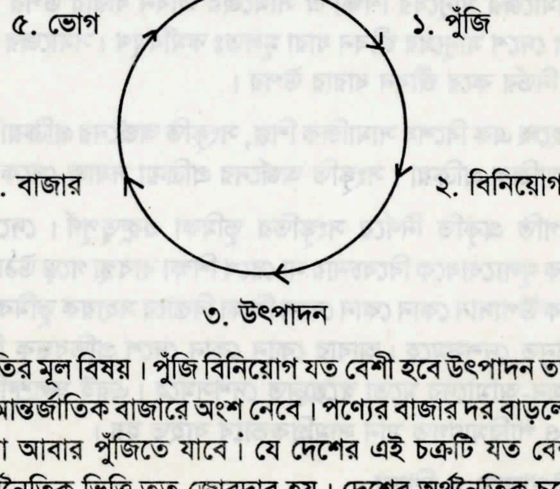

পুঁজি অর্থনীতির মূল বিষয়। পুঁজি বিনিয়োগ যত বেশী হবে উৎপাদন তত বাড়বে ফলে সেটা আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ নেবে। পণ্যের বাজার দর বাড়লে-ভোগও বাড়বে-সেটা আবার পুঁজিতে যাবে। যে দেশের এই চক্রটি যত বেশী ঘোরে সেখানে অর্থনৈতিক ভিত্তি তত জোরদার হয়। দেশের অর্থনৈতিক চক্রের গতি যতদ্রুত হয় তত তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতানুগতিকতা পরিহার করে

আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ। এ পরিস্থিতিতে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটে সমাজের অভ্যন্তরীণ টানেই। সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে এ অবস্থা "Pull factor" হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজে দ্রুত শিক্ষার বিকাশ ঘটে।

উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার প্রসার মূলতঃ এই প্রক্রিয়াতে হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক চক্রটি মন্থর গতির হলে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গতানুগতিকতা পরিহার করতে পারে না। ফলে দেশে গতানুগতিক পেশার আধিক্য থাকে। এ অবস্থায় সমাজে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা অনুভূত হয় না। এতে সমাজের অভ্যন্তর থেকে শিক্ষার প্রসারের চাহিদা আসেনা। শিক্ষাকে বাইরে থেকে ধাক্কা দিলে তা প্রসারের প্রয়োজন ঘটে। শিক্ষা বিস্তারের এই অবস্থাকে 'Push factor' বলা হয়। বাংলাদেশের মত অধিকাংশ অনুন্নত দেশে শিক্ষা বিস্তারে এই Push factor কাজ করে।

সাংস্কৃতিক উপদান ও শিক্ষা

সংস্কৃতির সাথে শিক্ষার একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সাধারণভাবে সংস্কৃতি বলতে বোঝায় জীবনধারা। প্রত্যেক মানুষ কোন কোন ভাবে সংস্কৃতির অধিকারী। মানুষের জীবন ধারার সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। একটি সমাজের মানুষের শিক্ষা ঐ সামজের জীবন ধারার উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে মানুষের জীবন ধারা মূলতঃ কর্মবিমুখ। সমাজের শিক্ষা কেমন হবে তা নির্ভর করে জীবন ধারার উপর।

সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ সামাজিক শিল্প, সংস্কৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়া হচ্ছে সামাজিক প্রক্রিয়া। সংস্কৃতি অর্জনের প্রক্রিয়া সমাজ থেকে শুরু হয়।

শিক্ষার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে সংস্কৃতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানুষের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে বিবেচনায় না রেখে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। সাংস্কৃতিক উপাদান কোন কোন দেশে শিক্ষা বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যেমন-উন্নত দেশসমূহে। আবার কোন কোন দেশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ কের যেমন-আমাদের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহে। এরই ফলশ্রুতিতে শিক্ষার গুণগত ও পারিমাণগত মান সামগ্রিকভাবে ব্যহত হয়।

ধর্মীয় উপাদান ও শিক্ষা

সমাজ কাঠামো তথা সামাজিক পরিবেশে ধর্মীয় উপাদানের সাথেও শিক্ষার

সম্পর্ক নিবিড়। সমাজে মানুষের ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন এবং ধর্মীয় আচার রীতি ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি শিক্ষার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় উপাদান যদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন না করে তবে সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আজকের উন্নত দেশগুলোতে ধর্মের ক্ষেত্রে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ধর্ম এসব দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর পরিবর্তে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে এসব দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষাও বিকশিত হচ্ছে অবিরত ধারায়। অন্যদিকে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশে ধর্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে রক্ষণশীল ও গোঁড়ামীর ভূমিকা পালন করে চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এর ফলে এসব দেশের আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে শিক্ষার বিকাশ ততখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেনা। বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে সমাজে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণে শিক্ষাঙ্গনেও স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

সামাজিক উপাদান-পরিবার ও শিক্ষা

সামাজিক কাঠামোর বিশেষ উপাদান হিসেবে পরিবার তথা গোটা সামাজিক পরিবেশ অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবারকে সমাজের মৌলিক একক বলা হয়। সমাজের মৌলিক একক হিসেবে পরিবার শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে সমাজের অধিকাংশ পরিবার প্রধান তাদের শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে ঘটেনা। অন্যদিকে যে সমাজে পরিবার এ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হয়, সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটে দ্রুত।

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবার সামজের মৌলিক একক হিসেবে তিনটি প্রধান কাজ সম্পন্ন করেঃ

১. **শিক্ষার প্রতি শিশুকে উৎসাহিত করাঃ** প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা, এ ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবার আগে, বিদ্যালয় পরে। শিশুকে বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত পরিবেশ পরিবারগুলোকে সৃষ্টি করতে হবে।

২. **শিশুর শিক্ষার পরিকল্পনা করাঃ** শিশুকে কে শিক্ষা দিবে? কোন ধরনের শিক্ষা দিবে? সেটা পরিবারকেই পরিকল্পনা বা নির্ধারণ করতে হবে।

৩. **শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করাঃ** এর কতগুলি দিক আছে, যেমন শিশু

শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

ব্যবস্থাপনা

(১) অর্থনৈতিক (২) মনঃস্তাত্ত্বিক (৩) সামাজিক

১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ঃ শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবারের যথাযথ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালনের সাথে পরিবার প্রধানের অর্থনৈতিক বিষয়টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে শিশুর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পরিবারকেই করতে হয়।

২. মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনাঃ শিশুর পছন্দ অপছন্দ হিসেবে তাকে স্কুলে দেওয়া হচ্ছে মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যবস্থাপনা। ঘরে ও বাইরে তার মনস্তত্ত্ব বুঝে তাকে স্কুলে দেওয়া উচিত।

৩. সামাজিক ব্যবস্থাপনা ঃ পারিবারিক পরিবেশে শিশুর শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা হচ্ছে সামাজিক ব্যবস্থাপনা।

যে সকল পরিবার এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে সে সব পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়াও ব্যহত হচ্ছে। যত বেশী সংখ্যক পরিবারকে এই ভূমিকায় আনা যাবে শিক্ষার মান তত বাড়বে। উন্নত দেশে পরিবার এ সব ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। এ ভূমিকা তারা অনেক আগে থেকে পালন করে আসছে বিধায় তাদের শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান বাড়ছে।

শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান নির্ভর করে সমাজের বিভিন্ন উপাদানের ইতিবাচক কার্যকারণ সম্পর্কের উপর। এ উপাদানগুলোর মধ্যে উলম্ব ও সমান্তরাল কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। একটি দেশের সার্বিক বিকাশ এগুলোর সাথে জড়িত। কোন দেশ শুধু শিক্ষায় উন্নত হলেই সে দেশ উন্নত হবে না, তার মধ্যে রাজনৈতিক , সামাজিক, সাংস্কৃতি, ধর্মীয় উপাদানের উন্নতি থাকতে হবে। যেমন-শ্রীলংকায়, শিক্ষার হার অনেক বেশী হলেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে উন্নত হতে পারছে না। তেমনি কোন দেশ যেমন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত হলেও তাদের উন্নতবলা হয় না। কারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের সীমাবদ্ধতা আছে। সমস্ত উপাদানের উলম্ব ও সমান্তরাল ধারার

ক্রিয়ার উপর শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত বিষয় জড়িত। সেটা যৌক্তিক না অযৌক্তিক তা দেখতে হবে। যদি যৌক্তিক সম্পর্ক থাকে তবে শিক্ষা ব্যবস্থাও উন্নত হবে।

বিভিন্ন দেশের উদাহরণ

উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ

কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। এ সকল দেশে রাজনৈতিক উপাদানের মধ্যে যৌক্তিক ক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার কারণে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষার ক্ষেত্রেও যৌক্তিকতা বিরাজ করছে। তারই ফলশ্রুতিতে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিকাশ ঘটেছে ইতিবাচক ধারায়। এ সকল দেশের কোনটিতে স্বাক্ষরতার হার ১০০% বা এর কাছাকাছি। এসব দেশের রাষ্ট্র জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ, প্রতিষ্ঠানগত স্বাধীনতা বিদ্যমান, সরকারের ব্যবস্থা সেবাধর্মী, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, সংবিধানে জনগণের স্বার্থরক্ষা হয়। সংবিধান পরিবর্তন হয় স্বাভাবিক ধারায়। অথবা নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, বিচার ব্যবস্থাও স্বাধীন, আমলাতন্ত্র যৌক্তিক ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও কম। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিদ্যমান। উন্নত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অনেক বেশী, তাদরে মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশী। উন্নত দেশগুলোতে অর্থনৈতিক চক্রের গতি দ্রুত, ফলে শিক্ষা 'Pull factor' হিসেবে কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত হলেই মাথাপিছু আয় বাড়ে ফলে মানব উন্নয়ন সূচকে এই সকল দেশ উপরে থাকে। বর্তমানে কানাডা এদিক দিয়ে সর্বোচ্চে অবস্থান করছে। ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৪৬তম, এসব দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিও দৃঢ় (UNDP: ১৯৯৫)।

উন্নত দেশগুলোর মানুষের জীবন ধারা তথা সাংস্কৃতিক ভিত্তির মধ্যে নিহিত আছে শিক্ষা প্রসারের চাহিদা। তাদের শিক্ষার প্রসার ঘটছে স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে এবং তাদের প্রযুক্তিগত উন্নতির সাথে সাথে বস্তুগত ও অবস্তুগত সংস্কৃতির বিকাশ লাভ করছে।

এ সকল দেশ ধর্ম রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামীর পরিবর্তে উদারনৈতিক ও প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে প্রতিটি ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষারও গুণগত ও পরিমাণগত মান বাড়ছে।

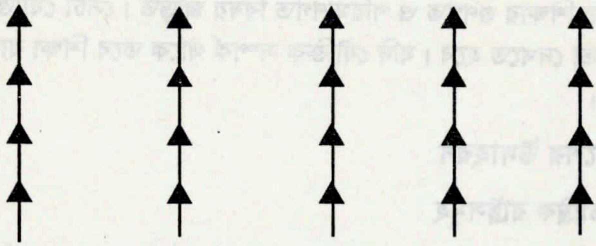

কানাডার লোকসংখ্যা ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত খুব কম বেড়েছে। ৪০ বৎসরে বেড়েছে মাত্র ১৩ লক্ষের মত। এদেশে মাথাপিছু আয়ও অনেক বেশী। ১৯৮৮-৯৩ পর্যন্ত মাথা পিছু আয় ছিল ১৯,৯৭০ ইউ এস ডলার। তাই তাদের শিক্ষার হারও অনেক বেশী। প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রছাত্রী ১০০% ভর্তি হয়। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার হারও অনেক বেশী। আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাত্র ১.২, যা ১৯৭০-৭৫ সালেও ছিল ১.৭ (Hunter : 1994 : 95)। ২০ বছরে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়েনি। তাদের নির্ভরশীল জনসংখ্যার হারও অনেক কম। এদেশের উন্নতির মূলে আছে সমাজ কাঠামোর সকল উপাদানসমূহের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক যা শিক্ষাকে প্রভাবিত করছে উন্নয়নের মূল ধারায়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ

মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়া ইত্যাদি দেশসমূহ।

উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বাধীনতা লাভের পর উন্নত দেশের অনুকরণ করে নিজস্ব সাহায্যে উন্নত হওয়ার চেষ্টা করে এবং কিছুটা সফলও হয়েছে। এ সকল দেশ বর্তমানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আছে এবং দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে উন্নতি বাড়ার সাথে সাথে শিক্ষারও বিস্তার ঘটছে।

মালয়েশিয়া একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটির জনসংখ্যা ১৯৮৮-৯৩ এর হিসেব অনুযায়ী ১৯.০৩ মিলিয়ন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও অনেক কম মাত্র ১.৪। তাদের মাথাপিছু আয় ১৯৮৮-৯৩ সালে ছিল ২১৪০ ইউ এস ডলার। কিন্তু ১৯৭০ সালে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৯০ ডলাল। মালয়েশিয়ায় দীর্ঘদিন যাবৎ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। যেহেতু সমাজ কাঠামোর সকল উপাদানের পরিচালন ভূমিকায় আছে রাজনৈতিক উপাদান। তাই এদেশ অন্যান্য সকল পর্যায়ের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রেও উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন

প্রাথমিক স্কুলে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ১৯৮৮-৯৩ সালে ৯৩% তেমনি মাধ্যমিক পর্যায়ে অংশগ্রহণ ৫৮% (A world bank report : 1995) । এ ধারা চলতে থাকলে অচিরেই তারা পৃথিবীর উন্নত দেশের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তাদের সঠিক পরিকল্পনা অন্যান্য উপাদানের সাথে শিক্ষাকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতার কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। স্পষ্টত:ই ঐ দেশের উন্নয়নের সাফল্য মূলত: কোরীয় জনগণেরই সাফল্য। শিক্ষার প্রতি কোরীয় জনগণের আগ্রহ ও আবেগের সাফল্য। শিক্ষার উঁচু হার, কাজের প্রতি আগ্রহ, প্রশিক্ষণের সুযোগ ইত্যাদি কারণেই সেদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এমন উঁচু হারে ধরে রাখা গেছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা- "Their relatively high level of education, motivation, trainability, and ability to work together have been noted as characteristics conducive to development. Of these characteristics there high level of education is considered to be attained and cultivated through the educational process" (Choo in Lee and Yamanzawa : 1990 : 171)

এ সকল উন্নয়নশীল দেশে সঠিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের সুসামঞ্জস্যের ফলে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানও সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল প্রভৃতি দেশসমূহ।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অনুকরণ করা হয় সর্বক্ষেত্রে। ফলে এসকল দেশে তত্ত্বগত ভিত্তি আছে কিন্তু বাস্তবে এর কোন অনুশীলন হচ্ছে না। দেশ দরিদ্রতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং এসব দেশে দারিদ্রের দুষ্টচক্র মানুষের জীবনকে পরিচালিত করছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এসব দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকলেও বাস্তবে কোন কিছুই গণতান্ত্রিকভাবে হচ্ছে না। রাজনৈতিক জবাবদিহিতা কোন ক্ষেত্রেই দেখা

যায় না। প্রতিষ্ঠানগত কোন স্বাধীনতা নেই। প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, বেশী ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত। এখানে অর্পিত গুণ বেশী কার্যকরী হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানে দেখা যায় যে, কয়েকটি পরিবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় বার বার ঘুরে আসছে। রাজনৈতিক দলগুলো কোন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে আসে না। সংবিধানে জনগণের স্বার্থরক্ষার কথা বলা হলেও ক্ষমতার অধিকারী দল তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তন করছে। নির্বাচনও এখানে সুষ্ঠুভাবে হয় না। আমলাতন্ত্র অধিক মাত্রায় অযৌক্তিক, কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালী এবং আমলারা রাজনৈতিক নেতাদের পরিচালিত করে।

এই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে কোন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। রাজনৈতিক দলের আধিক্য দেখা যায়। এমন রাজনৈতিক অবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও অনেক কম। অর্থনৈতিক চক্রটি এসব দেশে অনেক ধীরে ঘুরছে ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা স্বত:স্ফূর্তভাবে না এসে Push factor হিসেবে আসছে। এ কারণেই এসব দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে সন্ত্রাস, মারামারি, হানাহানি ফলে শিক্ষার বিকাশ সুষ্ঠুভাবে ঘটছে না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ চিত্রটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপাল, এ দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত বলা যায়। এসকল দেশের কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কেন এখনও স্বল্পোন্নত পর্যায়ে আছে। যেমন-বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১২.৭ কোটি, আয়তন অনুযায়ী পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনত্বপূর্ণ এ দেশ। মাথাপিছু আয় মাত্র ২৩৫ ইউ, এস ডলার। বার্ষিক রপ্তানীর পরিমাণ মাত্র ২.৫ বিলিয়ন, ইউ, এস, ডলার। কিন্তু বৈদেশিক দেনা অনেক বেশী ১৪.৮ মিলিয়ন ইউ, এস, ডলার (দৈনিক সংবাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৯৫)। এ চিত্র নিয়ে একটি দেশ কখনই উন্নতির দিকে এগুতে পারে না। তেমনি ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নেপালের অবস্থাও একই রকম। সর্বক্ষেত্রে এ নাজুক পরিস্থিতি দেশের সবকিছুকে দারিদ্রের পর্যায়ে রাখছে। তেমনিভাবে এসব দেশের শিক্ষার হারও অনেক কম। কিন্তু শ্রীলংকায় শিক্ষার হার বেশী সত্ত্বেও এদেশটি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে স্বল্পোন্নত পর্যায়ে আছে। কারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হলে অন্যান্য সকল পর্যায়ের স্বাভাবিক বিস্তার ঘটাতে হবে। কারণ শিক্ষা সমাজের সকল দিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো-

দেশের নাম	জনসংখ্যা (কোটিতে)	জিডিপি বৃদ্ধির হার (%)	মাথাপিছু আয় (ডলারে)	সঞ্চয়ের হার (জিডিপি'র)	বার্ষিক রপ্তানী (মিলিয়ন ডলার)	বৈদেশকি দেনা (মিলিয়ন ডলার)
বাংলাদেশ	১২.০৭	৪.৫৫	২৩৫	৭	২.৫	১৪.৮
ভারত	৯০.৭১	৪.২	৩১০	২৪	২৩.৫	৭৭.০
পাকিস্তান	১২.৬৪	৪.০	৪৪০	১৪	৭.৯	১৮.৪
শ্রীলংকা	১.৭৮	৬.৯	৫৫০	১৬	৩.০	৬.৪
নেপাল	২.১৩	২.৯	১৮০	১০	০.৪	১.৯
ভূটান	০.৬	৫.০	৪১৫	১৭	০.১	০.১
মালদ্বীপ	০.২	৬.১	৪৭০	৪৫	০.১	১.১

Source- দৈনিক সংবাদ,৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৫

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামো তিনটি স্তরে বিভক্তঃ

১. প্রাথমিক স্তর

২. মাধ্যমিক স্তর

৩. উচ্চ শিক্ষা স্তর।

বাংলাদেশের শিক্ষা কাঠামোর কোন স্তরেই শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান অনেক নীচে। অধ্যাপক শামসুল হক মন্তব্য করেছেন যে, "আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ কোন স্তরেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না" (মালেক আব্দুলঃ ১৯৯০)। বাংলাদেশের শিক্ষার পরিমাণগত মানের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ বছরে উপরের বয়সী জনসংখ্যার শতকরা ৭৫.৭ ভাগ নিরক্ষর। ১৯৫১ সালের এ হার ছির ৮১.৯ ভাগ। ১৯৯১ সালের হিসেবে এ হার ৭৫.২৮ ভাগ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে বাংলাদেশে স্বাক্ষরতার হারের তেমন উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইজ) এর হিসেব অনুযায়ী (১৯৮৮ সালের) বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী (৬-১০ বছর) শিশুর সংখ্যা ১

কোটি ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। এদের থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় শতকরা ৬০ভাগ। পঞ্চম শ্রেণী শিক্ষা সমাপ্ত করে তাদের শতকরা ২০ ভাগ এবং ঝরে পড়ে ৮০ ভাগ (BANBEIS : 1988)। বাংলাদেশে বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার পরিমাণগত মান অতি নিম্ন এবং পাশাপশি গুণগতমানও অনেক নিম্ন। প্রাথমিক স্তরে মাত্র ২৫% শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে অংশ নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের শিক্ষার গুণগত মান খুব খারাপ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা তাদের মৌলিক জ্ঞান সমাজে কাজে লাগাতে পারছে না। মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে যেখানে দেশের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ সৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করার কথা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা বহুলাংশে ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। ইউনেস্কোর মতে, বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য সার্টিফিকেট দেয়া, শিক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ করা নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার কারণসমূহ

বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত সংকট বা পরিমাণগত মান ও গুণগত মান উভয়ই নিম্ন। এ পর্যায়ে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রীই তাদের আগ্রহের বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে সাধারণ শিক্ষা লাভ করতে হয়। সামগ্রিক বিচারে বলা চলে যে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী যেহেতু তাদের পছন্দের কার্যক্রম এবং বিষয় অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে পারে না, সেহেতু এ ক্ষেত্রে তাদের মেধার অপচয় নিঃসন্দেহে ঘটে থাকে। সম্পদের অপচয়ও ঘটে থাকে।

বাংলাদেশে শিক্ষার এই পরিমাণগত ও গুণগত মান নিম্ন হওয়ার কারণ শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই নয়, সার্বিকভাবে সমাজ কাঠামোর প্রত্যেকটি উপাদান সমানভাবে দায়ী। বিভিন্ন উপাদানের সাথে শিক্ষার অযৌক্তিক সম্পর্কের ফলে এখানে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটেনি।

রাজনৈতিক কারণ

বাংলাদেশে শিক্ষা সংকটের বা পরিমাণগত ও গুণগত মান নিম্ন হওয়ার মূলে বিদ্যমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় কারণগুলোর পেছনে মৌলিক কারণ হিসাবে দায়ী করা যায় এদেশে বিদ্যমান দীর্ঘ দিনের স্বৈরতান্ত্রিক ও অযৌক্তিক রাজনৈতিক ধারা। এই ধরনের রাজনৈতিক ধারার কবলে পড়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলোর

যৌক্তিক বিকাশ ঘটতে পারেনি। এর নেতিবাচক ফলাফল সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারকে প্রভাবিত করেছে। এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে অর্থনৈতিক নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়া এবং সময়ের ব্যবধানে তা অনেক দূর প্রসার লাভ করেছে। তারই ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ পরিবার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যক্তি ও গোষ্ঠির স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাভাবিক বিকাশের ধারা ব্যহত করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিকৃত ধারা শুরু হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের অযৌক্তিক রাজনৈতিক ধারা সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ পরিবারকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা আত্মিকভাবে অসমর্থ করে তুলছে।

অর্থনৈতিক কারণ

বস্তুত বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হারের শ্লথ গতির মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক চক্রের মন্থর গতি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিগত বছরগুলোতে নানা প্রকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পরই প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সর্বজনীন শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক দূরে রয়েছি। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনপোযোগী ২০% ছেলে-মেয়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। যারা ভর্তি হয় পঞ্চম শ্রেণী পাশের আগে তাদের ৬০% ঝরে পড়ে। ১৯৯১ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কতখানি অর্জিত হবে তা বলা যায় না। এ সবের মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নিম্নগতি।

বাংলাদেশে অধিকাংশ অভিভাবক গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত। যে পেশা গ্রহণ করলে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়না সেটাই গতানুগতিক পেশা বা প্রাথমিক সেক্টর। মাধ্যমিক সেক্টর ও তৃতীয় সেক্টর বা সেবামূলক কাজে খুব কম লোক জড়িত। আধুনিক পেশা গ্রহণ করতে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে ৮২% পরিবার গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত। যেহেতু ৮২% লোক গতানুগতিক পেশার সাথে জড়িত তাই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না এবং বেশীর ভাগ মানুষকে শিক্ষায় টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে

না। ফলে Push factor হিসেবে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। অভিভাবকের নিম্ন আয়ঃ শিক্ষার ব্যয়কে প্রধানত দু' ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- যেমনঃ

শিক্ষার ব্যয়

সুযোগ দান জনিত ব্যয়

আনুমানিক ব্যয়

শিক্ষায় সুযোগ দান জনিত খরচ হলো লেখাপড়ায় যে সময়টা শিশুরা ব্যয় করছে তার একটা অর্থনৈতিক মূল্য আছে। সে সময়টা বাইরে কাজ করলে সে তার মূল্য পেত। যে সকল পরিবার এ খরচ মেটাতে পারে তারাই বাচ্চাদের স্কুলে পাঠায়। আনুমানিক খরচ হলো লেখপড়ার সাথে জড়িত বই, খাতা, জামা ইত্যাদি সংক্রান্ত খরচ। UNDP রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ৮০% লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। ৪০% লোক দারিদ্রের মধ্যে বাস করে। তাদের পারিবারিক আয় অনেক কম। UNDP রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের পারিবারিক আয় ১ ডলারের কম। অভিভাবকরা এই খরচ বহন করতে পারছেনা। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণ

বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে যে সকল গতানুগতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি আচার অনুষ্ঠান, প্রথা ও মূল্যবোধ বিদ্যমান রয়েছে সেগুলির ধারক ও বাহক হিসাবে পরিবারগুলি অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে বিশেষ করে গ্রামীন সমাজে শিক্ষার মান নিম্ন হওয়ার এটিও একটি কারণ। এক্ষেত্রে যে সকল বিষয় শিক্ষা প্রসারের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে সেগুলি হলো বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পর্দা প্রথা সম্পর্কে ভূল ধারনা ইত্যাদি।

বাল্য বিবাহ ঃ প্রথমত বাল্য বিবাহ দ্বারা অল্প বয়সেই অনেক বালক ও বালিকার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে। দ্বিতীয়ত- এ সকল দম্পতি তাদের শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে পরিপক্কতা আসার আগেই সন্তান জন্মদান করতে শুরু করে।

বস্তুত শিক্ষা ক্ষেত্রে বাল্য বিবাহের এ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াগুলি দুষ্ট চক্রের ন্যায় ক্রমাগত প্রজন্মের পর প্রজন্ম আবর্তিত হয়ে আসছে।

বহু বিবাহ ঃ বহু বিবাহ ভিত্তিক পরিবারগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার নিম্ন হওয়ার ক্ষেত্রে এটি অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যা বেশ প্রকট রূপ ধারণ করেছে। সমাজে নারী পুরুষের মর্যাদায় পার্থক্য থাকায় বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত সমস্যার প্রত্যক্ষ শিকারে পরিণত হচ্ছে নারীরা। এসব দুঃস্থ নারীদের ছেলে-মেয়েরা আদৌ শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়না। এটি বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বহুলাংশে সত্য।

পর্দা প্রথা ঃ বাংলাদেশের সমাজে পর্দা প্রথা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার অভাব দেশের নারী শিশুর উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে পর্দা প্রথা নেতিবাচক প্রভাব না ফেললেও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব ও মহিলা শিক্ষিকার অপ্রতুলতা দুটি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

সামাজিক ধর্মীয় কারণ

বাংলাদেশে অধিকাংশ পরিবারে বিরাজমান বিশেষ সামাজিক ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গি ও রীতিনীতির কারণেও শিক্ষা সংকট বিশেষ করে নারী শিক্ষায় সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশ গ্রামীন সমাজে এর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক ধর্মীয় কুসংস্কার জনিত কারণে অধিকাংশ পরিবারের অভিভাবক নিয়তির উপর নির্ভরশীল। নিরক্ষর ও স্বল্প শিক্ষিত ও সকল অভিভাবক বিজ্ঞান মনস্ক ও ইহজাগতিক চেতনা সম্পন্ন নয়। এ অবস্থায় তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার বিষয়টি নিয়তির উপর ছেড়ে দিয়ে থাকেন। এর ফলাফল হিসেবে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই গতানুগতিকতার প্রভাবমুক্ত হতে পারছে না। হতে পারছে না জাগতিক চেতনা ও প্রাধান্য সম্পন্ন একটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রাজ্যে পৃথিবীতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা আত্মস্থ করার মত সামাজিক মানসিকতা বা আন্দোলন সৃষ্টি হচ্ছে না বাংলাদেশে। এর ফলে বাংলাদেশে শিক্ষার গুণগত মানের বিকাশও ব্যহত হচ্ছে।

শিক্ষা সংক্রান্ত কারণ

"Education builds education" অভিভাবকরা শিক্ষিত হলে সন্তানরাও শিক্ষিত হয়। আমাদের মত দেশে স্বাক্ষরতার হার বাড়ছে না কারণ অভিভাবকরা নিরক্ষর। এজন্য Push factor হিসেবে বয়স্ক মানুষের উপর শিক্ষা প্রয়োগ করা হলে তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া শিখাবে। বিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রাতিষ্ঠানিক। কিন্তু সমাজের মৌলিক একক পরিবার। বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। এটা না হলে শিক্ষার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়।

সবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতার জন্য শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাই দায়ী নয়। অন্যান্য সামাজিক উপাদানও অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষার সাথে অন্যান্য উপাদানের সম্পর্ক ইতিবাচক না হওয়ায় যৌক্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শিক্ষার গতি প্রকৃতির উপর অযৌক্তিক প্রভাব ফেলছে।

পর্যালোচনা

উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সামাজিক কাঠামো ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার ফলে উন্নত দেশগুলিতে গত কয়েক বছরে অন্যান্য উপাদানের উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার হারও বেড়েছে। যেমন-কানাডার ১৯৭০ সালে G.N.P ছিল ৭৭১০ US$ এবং ১৯৯৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৯৯৭০ US$, এর সাথে সাথে প্রাইমারী স্কুলে অংশগ্রহণের হারও বেড়েছে এবং স্বাক্ষরতার হারও অনেক বেশী।

আবার উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এর ফল স্বরূপ শিক্ষা ক্ষেত্রেও তাদের স্বাক্ষরতার হার বেড়েছে। যেমন-মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, দঃ কোরিয়া প্রভৃতি দেশ। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশ যেমন-বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এ দেশগুলি প্রধানত রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে অন্যান্য উপাদানের নেতিবাচক প্রভাবের ফলে শিক্ষার হারও তেমন বাড়েনি। এর ফলে এ দেশগুলি দরিদ্রতার দুষ্ট চক্রের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে।

উন্নত দেশে স্বাক্ষরতার হার বেশী বলে তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কম। শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে স্থূল জন্মের হার কমে আসে ফলে স্থূল মৃত্যুহারও কমে, এর সাথে স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার কমে ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমে আসে (হক মোঃ নাজমুল ঃ ১৯৮৪)। যেমন নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার ও প্রজনন হারের তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো।

দেশ	১৫+ বয়সের স্বাক্ষরতার হার	প্রজনন হার
সুইডেন	১০০	১.৯
যুক্তরাষ্ট	৯৯	১.৮
হংকং	৮৮	১.৪
শ্রীলংকা	৮৭	২.৬
ইন্দোনেশিয়া	৭২	৩.৩
ভারত	৪৪	৪.২
বাংলাদেশ	৩২	৫.৩
নেপাল	২২	১২.৬
জাম্বিয়া	২০	৬.৩
সিয়েরলিউন	১৩	১৬.৫

Source : UNDP, Huamn Development Report-1991

আবার স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও জনগণের মধ্যে সচেতনতা আসে বিশেষ করে নারী শিক্ষা বাড়ার সাথে সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমবে। উন্নয়নশীল দেশ যেমন-কোরিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, হংকং এসব দেশে সঠিক সামাজিক কাঠামোগত উপাদানের যৌক্তিক সম্পর্কের কারণে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন GDP বৃদ্ধির হার বেশী কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে যেমন-ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, নেপাল, পাকিস্তানে অনেক কম (কাদের এম, এ, ১৯৯৩)।

নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের GDP বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো ঃ

রাষ্ট্র	১৯৮৮	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
কোরিয়া	১১.৩	৭.৩	৭.১	৭.০
তাইওয়ান	৭.১	৭.৪	৬.৬	৭.৬
হংকং	৭.৩	৭.৪	৪.১	৪.০
সিঙ্গাপুর	১১.০	৯.৪	৯.৯	৭.২
মালয়েশিয়া	৮.১	৮.০	৬.৫	৪.৯
ইন্দোনেশিয়া	৫.৭	৮.০	৬.৫	৪.৯
থাইল্যান্ড	৮.৪	১১.০	১০.০	৮.৫
ভারত	৯.০	৫.৭	৫.২	৪.৭
শ্রীলংকা	২.৬	৩.২	৩.০	২.৮
বাংলাদেশ	২.৬	২.১	১.৯	১.৮
নেপাল	৯.৭	২.৫	৩.০	৪.০
পাকিস্তান	৫.৮	৫.১	৪.৭	৫.২

Source : "উন্নয়শীল দেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন সমস্যা"-এম, এ কাদের, ১৯৯৩।

এভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে, আজকের বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে রাজনৈতিক উপাদানগুলোর মধ্যে যৌক্তিক ক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য ক্ষেত্রেও যৌক্তিকতা লাভ করেছে। তারই অঙ্গ হিসেবে শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মানের বিকাশ ঘটেছে ইতিবাচক ধারায়। এ সকল দেশের স্বাক্ষরতার হার ১০০% ভাগ। এসব দেশে শিক্ষার গুণগত মান অবিরত ধারায় সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এরই ফলশ্রুতিতে এসব দেশে উদ্ভাবিত হচ্ছে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলাকৌশল।

উন্নত দেশের সামাজিক পাবিবেশগত মাত্রাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এসব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অযৌক্তিক রাজনৈতিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা নিজস্ব সত্ত্বা নিয়ে সামনের দিকে এগুতে পারছে। শিক্ষা

ব্যবস্থার সাথে জড়িত যোগ্য ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ নিজেদের চিন্তা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে শিক্ষাকে প্রতিনিয়ত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তারা দৃঢ় প্রত্যয়ি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘদিন যাবৎ একটি অযৌক্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ প্রক্রিয়ায় এসব দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের সাথে শিক্ষা সংক্রান্ত উপাদানও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কবলে পড়ছে। এতে সকল ক্ষেত্রের ন্যায় শিক্ষা ব্যবস্থাও সামগ্রিকভাবে অব্যবস্থা ও অরাজকতা পরিস্থিতির মধ্যে নিপতিত হচ্ছে। সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতি ও পেশী শক্তির প্রসার লাভ করছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তার লাভ করছে, শিক্ষণ প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যহত। শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ তাদের অবদান রাখার সুযোগ পাচ্ছে না। এ প্রক্রিয়াই সামগ্রিকভাবে এসব দেশে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মানের বিকাশ ঘটাতে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপসংহার

যে কোন দেশের শিক্ষার বিকাশ সে দেশের সামাজিক কাঠামোর উপাদানগুলোর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। সামাজিক কাঠামোর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া শিক্ষার গতি ও প্রকৃতির উপর অহরহ প্রভাব ফেলে। এ প্রভাব যদি যৌক্তিক বা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে শিক্ষার বিকাশ ও ফলাফল যৌক্তিক হয় না। বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশে এ অযৌক্তিক ধারা চলে আসছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে দেশের জনগণকে শিক্ষিত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাড়াতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক উপাদানের যৌক্তিক প্রভাব। এর জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাসহ রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা, আমলাতন্ত্রে যৌক্তিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে। কারণ রাজনৈতিক উপাদান হচেছ অন্যান্য উপাদানের পরিচালক। রাজনৈতিক উপাদানই অন্যান্য উপাদানের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে ও শিক্ষার চাহিদা আসবে। আমাদের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ থেকে শিক্ষার চাহিদা অনুভূত হচ্ছে না। কারণ ৮৫% জনগণ নিম্নবিত্ত শ্রেণীতে বাস করে। তারা সচেতন নয়। তাই Push factor হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা কর্মসূচী নেওয়া হলেও এগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে না মূলতঃ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে। শ্রেণী কাঠামোগত মাত্রায় শিক্ষাকে বিচার করতে গেলেও শিক্ষার গুণগত ও

পরিমাণগত মান বাড়াতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটাতে হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসার একটা সমাজে যতখানি আছে তার উপর নির্ভর করে সেই সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশ। এর সাথে শিক্ষার বিস্তারও হতে হবে। এ দুটো পরস্পর সম্পর্কিত এবং নির্ভরশীল। এজন্য সমাজে বৃহত্তর নীতি (Macro policy) গ্রহণ করতে হবে। বৃহত্তর নীতি এমন হতে হবে যাতে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকে, যেন অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। শিক্ষাকে কোন অবস্থায়ই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাবে না।

তথ্য নির্দেশিকা

1. Swift, D. F., 1970, ***Basic Reading in The Sociology of Education***- London: Rut ledge And Began Paul.
2. Sukla, S. C., 1963, ***The Content of Education Developing Societies***- New Delhi : Central Institute Of Education.
3. Ashley, Beacon, Et. al, 1969, ***An Introduction to The Sociology of Education***, London : The Macmillan Co.
4. Choudhury Lutful Hoq : 1978, ***Social Change and Development Administration in South Asia,*** *NIPA, Dhaka.*
5. ***The Words Bank Of Encyclopedia;*** Vol-E
6. Tiled, Jandhyala B G., 1987, ***The Economics of Inequality in Education***-*Sage* Publications, New Delhi.
7. Deveauvais, Michael., 1981, ***Education and Development in The New International Economic Order,*** IIEP Occasional Papers, No 55. UNESCO International Institute Fro Educational Planning.
8. Rahman, HZ and Hossain, M., 1992; ***Rethinking Rural Poverty : A Case for Bangladesh*** (Mimeo) BIDS.
9. Ginsberg, M. (1934), ***Sociology,*** Oxford University, London.
10. ***Human Development Report,*** UNDP, 1995, (Published On 17th August 1995).
11. ***Bangladesh Bureau of Educational Informational and Statistics*** (BANBEIS), 1988, Dhaka.
12. Lee Change H, And Yamazawa Pipe, 1990, ***The Economic Development of Japan And Korea-A Parallel With Lessons,*** New York, West Port, Connecticut London.
13. ***First Five Year Plan,*** (1973-78), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
14. ***Second Five Year Plan,*** (1980-85), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
15. ***Third Five Year Plan,*** (1985-90), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.
16. ***Fourth Five Year Plan,*** (1990-95), Planning Commission, Ministry of planning, Government of Bangladesh, Dhaka.

১৭. আসাদুজ্জামান এবং নাসরীন জাহান জিনিয়া : ২০০০, *বাংলাদেশ বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সমস্যা: রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার একটি সমীক্ষা*, লোক প্রশাসন সাময়িকী, সপ্তদশ সংখ্যা, বিপিএটিসি সাভার, ঢাকা।

১৮. খালেকুজ্জামান : ২০০১, *শিক্ষা সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ*, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ঢাকা।

১৯. রহমান আতিউর : ১৯৯৪, *উন্নয়নে শিক্ষার অবদান : বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষনীয়*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ১১ম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা বি, আই, ডি, এস, ঢাকা।

২০. বাটোমোর, টম : ১৯৯২, *সমাজ বিদ্যা : তত্ত্ব ও সমস্যার রূপরেখা*, অনুবাদ হিমাচল চক্রবর্তী, কেপি বাগচী অ্যাড কোম্পানী, কলকাতা, ইন্ডিয়া।

২১. লতিফ, আবু হামিদ : ১৯৮৪, *উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও সমাজ শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২২. হক, মোহাম্মদ নাজমুল : ১৯৯১, *জনসংখ্যা শিক্ষা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৩. কাদের, এম, এ, ১৯৯৩ : *উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ও উন্নয়ন সমস্যা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৪. মালেক, আব্দুল : ১৯৯০, *বাংলাদেশের শিক্ষা সংকট-সামাজিক কারণের স্বরূপ বিশ্লেষণ*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বাংলা একাডেমী, কার্তিক-পৌষ ১৩৯৮, ঢাকা।

২৫. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৯৫ইং।

ISSN 1605-2021

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

ইংরেজি ভাষা শিক্ষা : নীতি ও কলা-কৌশল

হোসাইন রিদওয়ান আলী খান *

English Language Learning : Principles and Techniques

Hosain Ridwan Ali Khan

Abstract : English language can be learned comfortably by learning words and by translating English sentences, passages etc. into Bengali. Naturally we will learn many things by reading them in English. But for the purpose of mass education all those should be translated into Bengali. Such translating skill should be institutionalized in the education system and for that English language skill development can be connected mainly with English to Bengali translating skill. English word power play a pivotal role in English reading comprehension. Acquiring word power should be made easy by use of convenient techniques. So we can collocate words with parallel spelling (castigate/masticate; fauna/aura; fertile/termite); words with anagrammatic spelling (deprave/pervade; loiter/toiler); with similar roots/derivations (exonerate/onerous); and some more techniques. And monosyllabic words can be tabulated according to parallelism of spelling and alphabetical order and such tables can be conveniently used just from the beginning of learning of English language.

এ লেখা অনেকাংশে ইরেজি vocabulary building -এর বিষয়ে; কিন্তু এ লেখাতে ইংরেজি শিক্ষা (এ দেশে) সম্পর্কিত আরও অনেক বক্তব্যের অবতারণা থাকবে।

ইংরেজিতে ভাল পাঠক হতে হলে অজস্র ইংরেজি শব্দ আয়ত্ত করতে হয়। ইংরেজি শব্দ শেখার জন্য স্বতন্ত্র সাধনা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হয়তো অনেক ভাষার ক্ষেত্রে একথা সত্য। ইংরেজি শব্দ শিক্ষার বহুবিধ কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে। এ লেখায় প্রথমেই ইংরেজি শব্দ শিক্ষার কিছু নতুন কৌশল আলোচিত হবে।

দুই বা ততোধিক শব্দকে বানানের/উচ্চারণের মিল অনুসারে যদি গ্রুপবদ্ধ/সারণিবদ্ধ করা যায় তাহলে সেই গ্রুপ/সারণির মধ্যে লিখিত অপরিচিত শব্দগুলির সাথে পরিচয় সহজ হতে পারে। ধরুন লেখা হল :

---

* সহকারী সচিব, বাংলাদেশ সচিবালয়।

culminate
fulminate

এখন যদি কেউ culminate শব্দটি জানে, সে culminate-এর সঙ্গে fulminate শব্দটি মনে মনে যুক্ত করে শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যেতে পারবে সহজে। যদি দুটি শব্দই তার অজানা হয় তাহলে দুটি শব্দই একত্রে আয়ত্ত করা তার জন্য সহজ হবে, যেহেতু দুটি শব্দের মধ্যে বানানের এবং উচ্চারণ ধ্বনিরও মিল আছে। বানানের এধরনের মিলকে আমরা বানান সমান্তরতা– parallel spelling–বলতে পারি। আর উচ্চারণ ধ্বনির যে মিল আছে তাকে বলা যায় assonance। এখন লক্ষ করুন উল্লিখিত শব্দ দুটির সঙ্গে আরও শব্দ একযোগে লেখা যায় অভিন্ন ভিত্তিতে :

ultimate
cultivate
    culminate
    fulminate
    rusticate

এর কাছাকাছি আরও লেখা যায় lubricate এবং duplicate যা বানানের দিকে সমান্তরই তবে উচ্চারণে আগেরগুলির সঙ্গে অতটা assonant নয়। এর সঙ্গে আরেকটা কঠিন শব্দ যুক্ত করে আমরা লিখে ফেলতে পারি :

duplicate
    lubrticate
    rubricate

যদি একাক্ষর (একটি মাত্র সিলেবল বিশিষ্ট) শব্দগুলি এভাবে গ্রুপবদ্ধ করা যায় এবং সেগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো হতে থাকে তাহলে দেখা যাবে শব্দের সারণি (table) তৈরি হয়ে যাচ্ছে। এই সারণি দুই রকমের হতে পারবে এবং প্রত্যেক রকমই ছোট থেকে বড়, পাতলা থেকে ঘন হতে পারে। এসব সারণি সকলের জন্য শব্দ শিক্ষার উপকারী উপকরণ হতে পারে। সে সারণিতে পরে আসব। এখন উপরের বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করা ও তার মতো আরও বেশ কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক। নিচের শব্দগুলি বিবেচনা করুন:

molar
polar
solar
sonar

এখন এর মধ্যে polar এবং solar হয়তো অনেকের ভাল জানা কিন্তু molar এবং sonar হয়তো একেবারেই অপরিচিত। কিন্তু গ্রুপটির সম্মুখীন হওয়াতে পরিচিতিটা হয়ে যাবে এবং molar এবং sonar –সহজে শিখে নেওয়া সম্ভব হবে। আবার–

fauna

sauna

এই দুটি শব্দই কারও অপরিচিত হতে পারে, কিন্তু দুটিকে একত্রে পাওয়ায় দুটি বা দুটির একটি শিখে ফেলা সহজ হয়ে যেতে পারে।

ঘটনাক্রমে এ পর্যন্ত দেওয়া শব্দগুলির মধ্যে rhyme-ও আছে কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য parallel spelling। সুতরাং molar polar solar sonar–এই শব্দগুলি সঙ্গে আরও লেখা যায় nomad monad gonad Roman woman local vocal opal oval moral coral goral, fauna sauna-এর সঙ্গে আরও লেখা যায় trauma Laura aura Paula। সাধারণভাবে আমরা যে ধরনের গ্রুপ চাই তার কতগুলি নমুনা তুলে ধরছি, তবে এরকম আরও অনেক অনেক গ্রুপ তৈরি করা সম্ভব :

emetic	say/assay	elm/mail	ermine
benefit	sail/assail	elf/fail	termite
demerit	tumult	carrot	fertile
generic	suburb	parrot	supple
argot	arable	maggot	puzzle
arson	parable	faggot	element
argon	harmonic	captivate	vehement
jargon	sardonic	castigate	tenement
carton	damsel	masticate	ceremony
pardon	pastel	emulate	hegemoney
matron	buffet	peculate	episode
patron	puppet	antimony	epitome
apron	turret	matrimony	permit
saffron	pummel	acrimony	hermit
dacron	tunnel		vermin
ransom	garret		acolyte
phantom	barren		anodyne

এবার আরেক ধরনের বানানের মিলের প্রসঙ্গ। please শব্দটাই ধরুন। please শব্দটির বর্ণগুলি অন্যভাবে সাজিয়ে পাওয়া যেতে পারে elapse শব্দটি, please এবং elapse (এবং asleep-ও) একে অপরের anagram। এখন যদি লেখা হয়

please
elapse

তাহলে association-এর মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কঠিন elapse-এর পরিচিতি ও শিক্ষা সহজ হবে। anagrams-এর ডিকশনারি আছে। তার থেকে বাছাই করে শব্দ শিক্ষায় ব্যবহার করার জন্য অজস্র শব্দ নেওয়া যায়। কিছু উদাহরণ দেব।

anagram-এর মধ্যেও নানা বিশেষত্ব আছে। lobster এক ধরনের চিংড়ি। lobster শব্দটির anagram হচ্ছে bolster। সুতরাং আমরা লিখতে পারি

lobster
bolster

লক্ষণীয় যে শব্দ দুটির spelling -ও parallel, উচ্চারণে রয়েছে assonance, রয়েছে rhyme-ও। আগের যেসব উদাহরণে আমরা parallel spelling দেখেছি তার মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে rhyme-ও পাওয়া যাবে। এখন anagram-এর প্রসঙ্গে আরেক রকম উদাহরণ– golf উল্টালে হয় flog, তেমনি laud/dual, leper/repel, lever/revel। anagram সম্পর্কিত আরও উদাহরণ :

lease/easel	derange/grenade
alloy/loyal	deprave/pervade
dormant/mordant	sprite/stripe
loiter/toiler	saviour/various
latent/talent	laconic/conical
decimal/medical	maniac/caiman
decimate/medicate	famine/infame
	consolidates/ disconsolate
	alter/alert
	allot/atoll
	robe/bore

এ ধরনের উদাহরণ এখানেই শেষ করছি, এ হচ্ছে বিশাল তালিকা (যা আমি ইতিমধ্যে তৈরি করেছি) থেকে অল্প কিছু উদাহরণ। এবার আমি এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসঙ্গে কিছু নীতিগত বক্তব্য তুলে ধরতে চাই।

ইংরেজি শব্দশিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা, ইত্যাদি প্রসঙ্গ কেন? সরকারি স্বীকৃতির অবস্থা যাই হোক না কেন, অন্তত সকল বঙ্গবাসী বঙ্গভাষীর পক্ষে ইংরেজি হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষা। ঐতিহাসিক কারণে এমনটা হয়েছে। তাছাড়া ইংরেজি আন্তর্জাতিক ভাষাও বটে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বঙ্গভাষীর জন্য জ্ঞান-বিদ্যা তথ্য আহরিত হবে এটা স্বাভাবিক। যদিও এটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে যতটা সম্ভব মাতৃভাষায় বিদ্যার্জন সব মানুষের জন্মগত অধিকার (এবং দায়িত্ব)। মানে দাঁড়ায় যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞান বিদ্যা তথ্য সাহিত্য ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আসতে থাকবে তবে তা ক্রমাগত বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হওয়া উচিত যাতে তা বঙ্গীয়দের কাছে মাতৃভাষায় প্রাপ্য হয়। বাংলা ও ইংরেজির এই পারস্পরিক ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের জাতির সজাগ সচেতন হওয়া দরকার, তা কার্যকর হওয়া দরকার, তাহলেই জাতি সভ্য জগতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারবে, অন্যথায় নয়। মনে রাখা দরকার নিছক ভাষা-শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নয়। ভাষা শিক্ষার মাধ্যম, এবং ব্যাপক গণশিক্ষার জন্য মাতৃভাষাই মাধ্যম হওয়া প্রয়োজন। যারা ইংরেজিতে অতিরিক্ত কিছু শেখার সৌভাগ্য অর্জন করবে তাদের একটি প্রধান কাজ হবে ঐ অতিরিক্ত শিক্ষাকে অনুবাদ বা ভাবানুবাদের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করা। এজন্য এদেশে বঙ্গানুবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং বঙ্গানুবাদের দক্ষতা সৃষ্টিটা হওয়া দরকার অনুষ্ঠানিক শিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ।

তাই এদেশে ইংরেজি শেখা মানে হওয়া উচিত প্রধানত ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে শেখা, বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি শেখা। এদেশের শিক্ষানীতি সেভাবেই সাজাতে হবে। এদেশের একজন মানুষ হিসাবে একজনার ইংরেজি শেখার প্রধান উদ্দেশ্য হবে ইংরেজি পড়ে বুঝতে পারা। সে ইংরেজিতে কত ভাল লিখতে পারল তার গুরুত্ব থাকা উচিত অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক কম। ইংরেজি শিক্ষা পদ্ধতিও সে অনুযায়ী হওয়া উচিত—বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষার এবং সাধারণভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে পাঠ্যবই ইংরেজিতে হলেও পরীক্ষার খাতায় বাংলা উত্তর দেওয়ার নিয়ম হওয়া উচিত। ইংরেজিতে লেখার শিক্ষা বর্জিত হতে হবে তা বলছি না কিন্তু তা হবে সীমিত, পরবর্তী, বিশেষ; প্রাথমিক ও সাধারণ নয়।

এবারে শব্দ শিক্ষা প্রসঙ্গে। ভাষার আসল কথাই শব্দ, বর্ণমালা শব্দকে শেখার জন্য ব্যবহার্য চিহ্ন। আর শব্দকে সাজিয়েই বাক্য, phrase, শব্দগুচ্ছ ইত্যাদি। আমার মতে একজন নব্য শিক্ষার্থীর প্রথমেই বর্ণমালা মুখস্থ করতে হয় না, শব্দশিক্ষার মাধ্যমেই ক্রমে (বর্ণানুক্রমে নয়) বর্ণগুলির সঙ্গে পরিচিত হলে চলে। তারপর অনেক শব্দের সঙ্গে পরিচিতি হয়ে গেলে শব্দগুচ্ছের, বাক্যের ও অনুচ্ছেদের অনুবাদের মাধ্যমে সে ভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হবে (আসলে শব্দার্থ জানাও তো অনুবাদ ছাড়া আর কিছু নয়।)। তারপর ঐ ভাষায় যত কঠিন ও বিচিত্র বিষয়ে সে পড়াশুনা করতে চাইবে তত তার বেশি বেশি শব্দের দরকার হবে।

এ কথা আর বেশি ব্যাখা করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বঙ্গ-সন্তানকে বাংলায় ও ইংরেজিতে পড়তে এবং প্রধানত বাংলায় লিখতে পারদর্শী হতে হবে। ইংরেজিতে ভাল পড়তে পারা ও বাংলায় ভাল লিখতে পারা একসঙ্গে হতে পারে যদি ইংরেজি শিক্ষাটা হয় ইংরেজি থেকে বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে। এর থেকে বোঝা যায় এদেশের শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা শুরু হওয়া উচিত আগে, ইংরেজির আগে, পরে নয়, এমনকি ইংরেজি বাংলা একযোগে শুরু হওয়াও উচিত নয়। মাতৃভাষা দিয়ে ভাষা শিক্ষার সূচনা সহজ কারণ অনানুষ্ঠানিকভাবে এর শিক্ষা তো শুরু হয়ে যায় জন্মের প্রায় পর পরই। শুধু সেজন্য নয়। মাতৃভাষায় দখলটা নিশ্চিত হওয়া চাই, দ্বিতীয় ভাষার চাপে তাতে যেন কোনও ঘাটতি না ঘটে যায়। দ্বিতীয় ভাষার চাপে শিক্ষা জীবনের গোড়া থেকে অনেক শিশু ঝরে যাক সেটাও কোনও মতেই কাম্য হতে পারে না। শিক্ষা কাকে বলে? টমাস আলভা এডিসন কি শিক্ষিত ছিলেন? তিনি তো কোনও দ্বিতীয় ভাষা জানতেন না। এমনকি স্কুল শিক্ষাটাই তিনি কখনও শেষ করেননি। সুতরাং দ্বিতীয় ভাষা শেখার apditude-এর অভাব থাকলেই একজন শিক্ষার্থী শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়বে এমনটা যেন কিছুতেই না হয়। তাছাড়া বঙ্গসন্তান তার স্কুল শিক্ষা জীবনের প্রথম ৫ কি ৭ বছর বাংলা শিখতে শিখতে ও বাংলায় জ্ঞান অর্জন করতে করতে [সেজন্য উপযুক্ত বইপত্র তৈরি হয়নি তবে সদিচ্ছা ও চেষ্টা থাকলে হতে কতক্ষণ?] সে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রচুর ইংরেজি কথা/শব্দ শিখে ফেলবে যা হতে পারে আনুষ্ঠানিক ইংরেজি শিক্ষা শুরুর জোরালো ভিত্তি (মাতৃভাষার ক্ষেত্রে যেমন হয়)।

সুতরাং তার ইংরেজি শিক্ষা শুরু হতে পারে এই শব্দগুলি দিয়ে :

bad	bag				bank					bat	ball		
						cap		cash		cat	call	car	card
			fan							fat			
							gas						
				hand						hat	hall		
		lamp							last				
mad			man										
			pan										
										rat			
					tank								

bed	beg	bell	-	big	bill	-	-	bird	
			pen		mill	milk	-		list
			ten			silk	pin		
							tin		

cold	-	-	-	-	-	cup	cut
gold	-	-	-	-	fun		
	hot	-	-	gum	gun		
	not	-	jug				
	pot	-	mug				
		tub	-				

				blade	
		game	gate		
			late		plate
	race				
table					

	mile		
		nine	
			pipe
side			

	book		
good			
		-	moon
-		room	-

	boat
	coat
road	

উপরে নয়টি table বা সারণি আছে। শিশুপাঠ্য ইংরেজি শিক্ষা বই-এর প্রথম পৃষ্ঠায় এমন নয়টি সারণি থাকতে পারে। এরপরে থাকতে পারে এই নয়টি সারণির combination একটি বড় সারণি:

Table-2-1

bad	-	-	bed							
bag	-	-	beg	big						
-	ball	-	bell	bill						
-	-	-	belt	-						
bank	-	-	-	-					book	
-	-	-	-	-	bird					
bat	-	-	-	-						boat
-	call	-	-	-	-					
					cold					
cap						cup				
		car								
		card								
cash										
cat						cut				coat
fan						fun				
									good	
					gold					
						gum	game			
						gun				
gas										
							gate			
	hall									
hand										

hat					hot					
						jug				
lamp										
last				list						
							late			
mad										
						mug				
								mile		
man									moon	
								nine		
			net		not	nut				
pan			pen	pin						
								pipe		
					pot					
							race			
									room	road
rat										
								side		
				silk						
						tub				
							table			
			ten	tin						
tank										
class							blade			
glass							plate			

বইটির তৃতীয় পৃষ্ঠায় কী থাকবে বা পরের lesson কী হবে সে আলোচনায় আর যাওয়া চলবে না তবে উপরে আমরা যা পেলাম তা হচ্ছে : ইংরেজি monosyllabic শব্দগুলিকে tabulate করা যায় দুভাবে, যার ক্ষুদ্র নমুনা মাত্র উপরে পাওয়া গেল। ওরকম শব্দ যত যোগ করা হবে তত table বা সারণি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বা ঘনত্বে বেড়ে যাবে, আর এই table হচ্ছে শব্দ শিক্ষার এক উত্তম পদ্ধতি যা শিশু শিক্ষার্থীর বেলায় শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত বা বলা যায় অসীম পর্যন্ত প্রয়োগ করা যায়। সামগ্রিকভাবে এরকম tabulation করতে গেলে কাজটা কঠিন হবে। উদ্ভূত table হবে বিশাল। কিন্তু তা করা সম্ভব,তা ছাপানোও সম্ভব।

শিশু শিক্ষার্থীর জন্য প্রথমে কোন রকমের ইংরেজি হরফ দিয়ে শুরু করা হবে–ছাপার বড় হাতের বা ছোট হাতের? এখানে একটি গুরুতরো প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। ইংরেজি হরফ কেন চার রকমের হতে হবে–ছাপার বড় হাতের ও ছোট হাতের এবং হাতের লেখার বড় হাতের ও ছোট হাতের–মোট চার রকমের? তাহলে ইংরেজিতে বর্ণ মাত্র ২৬টা হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে শিখতে হচ্ছে এবং সাধারণভাবে ব্যবহার করতে হচ্ছে ২৬×৪=১০৪টি বর্ণ-চিহ্ন। বড় হাতের বর্ণ বাদ দেওয়া যায়। তাতে ভাষাটির কোনও ক্ষতি হবে না, শুধু পূর্ণ বিরাম চিহ্ন (full stop)-টাকে একটু বড় করতে হবে এবং সেটা লাইনের মাঝ বরাবর প্রয়োগ করতে হবে। ছাপার ছোট হাতের এবং লেখার ছোট হাতের হরফের চেহারা সমন্বয়ের মাধ্যমে এক করে ফেলতে হবে। ব্যাস, তাহলে মাত্র ২৬টি চিহ্নেই কাজ চলবে। পৃথিবীব্যাপী এটা করা হলে একটি আন্তর্জাতিক ভাষার efficiency বেড়ে যাবে, ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রয়োগের efficiency বেড়ে যাবে, আরও অনেক কিছু।

capital letter-এর প্রয়োজনটা রোমানরা বোধ করেছিল পাথরে দেয়ালে বড় করে খোদাই করার প্রয়োজন থেকে। এখন আর সে ধরনের প্রয়োজন বোধ করার কোনও কারণ নেই। সুতরাং capital letter বাদ দেওয়া সমীচীন, যেমন এখন আর আমাদের বাংলা ভাষায় সাধু ভাষা চালু না রাখাই সমীচীন। capital letter বাদ দেওয়াটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু হলে খুব সুবিধা হত, কিন্তু তা যখন হচ্ছে না তখন বাংলাদেশ থেকে শুরু করতে দোষ কী–আবার স্মরণ করি, ইংরেজি আমাদেরও ভাষা, আমাদের দ্বিতীয় ভাষা। বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষায় লেখা ছাপা ইত্যাদি বড় হাতের হরফ বাদ দিয়ে চালানো যেতে পারে। এতে করে পৃথিবীব্যাপী একটি সম্ভাব্য আন্দোলনের সূত্রপাত বাংলাদেশ থেকে হয়ে যাবে।

বাংলাদেশ থেকে আর একটা কাজ শুরু করা যায়। তা হচ্ছে q বর্ণটি পুরাপুরি বাদ দেওয়া। q-এর কাজ k দিয়ে [বিশেষত qu-এর কাজ kw-দিয়ে, যেমন kwality, que -এর কাজ kue-দিয়ে, যেমন oblikue] চালানো যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোড়াতে ইংরেজিতে q বর্ণটি আদৌ ছিল না। ইংরেজি ভাষায় ফরাসি ভাষার শব্দের আগমনের সাথে সাথে সে সব শব্দের সঙ্গে q বর্ণটি ইংরেজিতে প্রবেশ করে।

অবশ্য oblique-কে oblik-ও করা যায় (oblikue না করে)। এটা বানান পরিবর্তনের বা সংস্কারের প্রসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। সে প্রসঙ্গে না হয় না-ই গেলাম। তবে আপাতত আমেরিকানদের বানান পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করতে পারি বৃটিশদের পদ্ধতি ত্যাগ করে। এটা করাতে দুঃসাহসিকতার কিছুই হবে না। মার্কিন-পদ্ধতিতে বানান অপেক্ষাকৃত সহজ। আমরা মার্কিন অনেক কিছু গ্রহণ করে আসছি অনেক কাল থেকে–গম, অর্থ, সাহিত্য, কত কী। কিন্তু তাদের বানান-পদ্ধতিটা গ্রহণ করতে কারা আটকাচ্ছে?

এখন আবার শব্দ-শিক্ষা প্রসঙ্গে আসা যাক। শব্দ-শিক্ষা সহজ করার জন্য যত বিভিন্ন ধরনের মিল অনুসারে শব্দাবলিকে collocate করা যায় তার মধ্যে parallel spelling এবং anagram নিয়ে আলোচনা লেখার শুরুতেই করা হয়েছে। আরেক ধরনের মিল হচ্ছে etymology-র মিল। যদি একাধিক শব্দের মধ্যে prefix, suffix অথবা root-এর মিল থাকে তাহলে তাদের বানানেও মিল ঘটে। exonerate একটি শব্দ যার সঙ্গে root-গত মিল আছে onerous শব্দটির, এবং onus শব্দটিরও (root টি হচ্ছে লাতিন onus)। সুতরাং আমরা exonerate, onerous এবং onus একত্রে লিখতে পারি। তেমনি মিল আছে impeccable এবং peccadillo-এর মধ্যে (root হচ্ছে pecco), আরও উদাহরণ লক্ষ করুন :

belligerent/rebellious
candid/incandescent/candle
veracious/aver/verify/verity
voracious/carnivorous/devour
vulgar/divulge
orthodox/dogmatic
panacea/pantomime
petroleum/petrify
antipodes/tripod
anatomy/epitome/entomology/atom

etymology-এর মিল অনুসরণ করে অনেক কঠিন কঠিন শব্দ সহজে আয়ত্তে আনা সম্ভব।

শব্দ শিক্ষার সুবিধার্থে eponymous অর্থাৎ ব্যক্তি নাম ভিত্তিক এবং toponymous অর্থাৎ স্থান নাম ভিত্তিক শব্দগুলিকে একত্রে পাঠের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া শব্দের সঙ্গে জড়িত কৌতুহলোদ্দীপক কথা কাহিনি ইতিহাস আলোচনা করা যায়। এ ছাড়া বিষয়ভিত্তিক শব্দাবলিও একত্র করলে তা শিখতে সুবিধা হতে পারে। etymology-এর মিল সহ শব্দাবলি, বিষয়ভিত্তিক শব্দাবলি ইত্যাদির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যাবে Norman Lewis-এর Word Power Made Easy নামের বইটিতে। Wilfred Funk-এর একটি বই আছে Word Origins & Their Romantic Stories নামে। এ ধরনের বই থেকে আগ্রহী পাঠক উপকৃত হতে পারেন। তবে parallel spelling এবং anagram ব্যবহার করে কেউ vocabulary building-এর বই লিখেছেন এমন আমার জানা নেই। এর উপর আপনি নিজে নিজে কাজ করতে থাকলে আপনি নিজে অনেক শব্দ শিখতে পারবেন, ইচ্ছা করলে আপনার আপনজন কাউকে তা শেখাতে পারবেন এবং শেষটায় হয়তো আপনিই একটি চমৎকার বই বের করে ফেলতে পারবেন।

তথ্য নির্দেশকা

Della Jhompson (ed.), ***The Oxford Dictionary of Current English.*** 1998, Oxford University Press, Oxford.

Michael Curl, ***The Wordsworth Dictionary of Anagrams.*** 1982, Wordsworth Editions Ltd, Hertfordshire.

Norman Lewis, ***Word Power Made Easy.*** 1994, Bloomsbury, London.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ ঃ বহুমাত্রিক প্রভাব

মোঃ শরীফ হাছান *

Permanent Settlement 1793 : Its Multi Dimensional Impact

Md. Sharif Hasan

Abstract : British East India Company conquered Bengal in 1757. The British Company introduced a number of reforms in the land management of Bengal for perpetuating the exploitation process. Ten years, five years and one-year settlement were introduced after one another and they failed to bring about desired result. Then, Lord Cornwallis introduced historical 'Permanent Settlement' of land in Bengal in 1793. Under this system landlords, popularly known as ' Zaminders' could raise revenue from their 'Rayats' at will. On the other hand, the 'Zaminders' had to pay affixed amount of annual revenue to the company government on a particular date before sunset. This is commonly known as 'Sunset Law'. A large proportion, around fifty percent of the 'Zaminders' were evicted from their 'Zaminderies' with the introduction of the law within the next fifty years. This system influenced the social, economic and political,lives of Bengal. The study aims to analyze the background, contemporary socio economic and political condition. It also tries to highlight both the positive and negative impacts of the system on the society, economy and politics of Bengal.

বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অভিহিত করা যায় একটি মাইলফলক হিসেবে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে প্রধানত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলার ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কারে প্রয়াসী হয়। উদ্দেশ্য দুটি হলো (১) কোম্পানীর রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং (২) বাংলায় কোম্পানীর শাসকদের অনুগত একটি সামন্ত শ্রেণী সৃষ্টি করা; যারা যে কোন সংকটের সময় শাসক শ্রেণীর অবলম্বন বা সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগস্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা এবং মুর্শিদাবাদের নবাবকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা প্রদানের বিনিময়ে সুবে বাংলার রাজস্ব আদায়ের

* সহকারী পরিচালক, বিপিএটিসি,সাভার, ঢাকা।

দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নামমাত্র নবাবের উপর। দিওয়ানী লাভের পর কোম্পানীর রাজস্ব সংকটের সুরাহা হয়। অন্যদিকে কোম্পানীর নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে জনগণের জীবন হয়ে পড়ে অতিষ্ঠ। ইচ্ছামতো রাজস্ব আদায় চলতে থাকে। আলীবর্দী খানের সময় পূর্ণিয়া জেলায় বাৎসরিক রাজস্ব ছিলো চার লক্ষ টাকা। ১৭৬৯ সালে তা পঁচিশ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। দিনাজপুর জেলায় বার্ষিক রাজস্ব বার লক্ষ টাকা থেকে সতের লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়। এহেন অত্যাচার এবং অনাবৃষ্টি জনিত খরার কারণে ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় দেখা দেয় এক মহাদুর্ভিক্ষ, যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। চালের মূল্য বাড়তে বাড়তে টাকায় একমণ থেকে টাকায় তিন সেরে পৌছায়। জীবিত মানুষ কর্তৃক মৃত মানুষের মাংস ভক্ষণের ঘটনার বর্ণনা দেন মুর্শিদাবাদের কোম্পানীর আবাসিক প্রতিনিধি রিচার্ড বেচার। বঙ্গদেশের প্রায় অর্ধেক লোক এ মহা দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করে (ইসলাম, ১৯৮৭)। অন্যদিকে কোম্পানীর অর্থগৃধ্নুতা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ বিপর্যয়ের পরও বাংলাদেশের রাজস্ব ১৭৬৮ সালের ১৫২০৪৮৫৬ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৭১ সালে ১৫৭২৬৫৭৬ টাকায় দাঁড়ায় (উমর, ১৯৮৩)। এ দুর্ভিক্ষের পরোক্ষ ফল হলো কুখ্যাত দ্বৈত শাসনের অবসান। কোম্পানীর দায়িত্বহীন ক্ষমতা ও দ্বৈত শাসন যে মন্বন্তরের জন্য দায়ী তা ফোর্ট ইউলিয়াম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স দ্বৈত শাসন অবসান করে সরাসরি শাসনভার গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করে এক আদেশ জারী করে। সে আদেশক্রমে ফোর্ট উইলিয়াম কর্তৃপক্ষ ১৭৭২ সালে দেশের প্রশাসনিক দায়িত্বভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

এহেন পরিস্থিতিতে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের উপর এমন একটি ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব অর্পিত হয় যা দেশবাসী ও কোম্পানী উভয়ের জন্য লাভজনক হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে হেস্টিংসের সামনে তিনটি প্রধান সমস্যা দেখা দেয়। এগুলো হলো ঃ

প্রথমত, হেষ্টিংসের সামনে এদেশের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে কোন রেকর্ড ছিলো না। কারণ এ সম্পর্কে পূর্বে কোন জরীপ হয়নি;

দ্বিতীয়ত, কার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হবে? কোম্পানীর হাতে রাজস্ব আদায়ের মতো যথেষ্ট লোকবল ছিলো না। অতএব কোম্পানী কর্তৃক সরাসরি রাজস্ব আদায় না করে এজেন্টদের মাধ্যমে তা আদায় করাই যুক্তি সঙ্গত;

তৃতীয়ত, কারা হবে এ এজেন্ট? জমিদার না ইজারাদার? জমির সঙ্গে জমিদার বা জোতদারের সম্পর্ক কী হবে? (ইসলাম, ১৯৮৭)।

পাঁচ সনা, এক সনা ও দশ সনা বন্দোবস্তঃ ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজ বিচার বুদ্ধি বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন স্থায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন প্রয়োজন। এর পূর্বে স্বল্প মেয়াদী ভূমি ব্যবস্থার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। দেশের প্রকৃত ভূমি রাজস্ব স্থির করা ছিলো একটি বড় সমস্যা। কোম্পানী সরকার বুঝতে পারে যে জমিদার তালুকদারগণ কোন অবস্থাতেই জমির প্রকৃত মূল্য প্রকাশ করবে না। সে জন্য হেস্টিংস ১৭৭২ সালে পাঁচ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। এ বারে অর্থের লোভে একদল লোভী ইজারাদার নিয়োগ করা হলো, যারা সবচেয়ে বেশী খাজনা আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিলো তাদের মধ্যে থেকে। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জোতদারেরা অত্যন্ত চড়া হারে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা ও আবওয়াব আদায় করতে থাকলো। কৃষকদের উপর অত্যাচার এতো চরমে উঠলো যে ১৭৮৩ সালে রংপুর ও দিনাজপুরে শেষ পর্যন্ত কৃষকেরা মরীয়া হয়ে ইজারাদারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে (কবিরাজ ১৯৮০)। ঢাকা প্রাদেশিক কাউন্সিলের প্রধান রিচার্ড বারওয়েল রিপোর্ট দেন (১লা ফেব্রুয়ারী ১৭৭৫) "দেওয়ানী লাভের পর হইতে বিশেষ করিয়া ১৭৭২ সালের ইজারাদারী বন্দোবস্তের পর হইতে দেশের কৃষি ও কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে (ইসলাম, ১৯৮৭)। পাঁচ সনা বন্দোবস্তের ফলাফল কোর্ট অব ডাইরেক্টরকে জানানো হলে কোর্ট বাৎসরিক মেয়াদে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দেয়। একটি শক্তিশালী বোর্ড অব রেভিনিউ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক জেলায় নিযুক্ত হন একজন কালেক্টর। এ বোর্ড কালেক্টরদের মাধ্যমে জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব বন্দোবস্ত করে। বাৎসরিক মেয়াদে সরকারী রাজস্ব দাবী যে সব জমিদার গ্রহণ করেননি তাদের জমিদারী ইজারাদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়। উক্ত জমিদারগণ বাৎসরিক শতকরা ১০টাকা মালিকানা ভাতার পরিবর্তে তাদের জমিদারী ইজারাদারদের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়। এর ফলে কৃষকদের উপর ইজারাদারদের শোষণ-নির্যাতন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। ১৭৮৬ সালে ইংল্যান্ডের এক ভূস্বামী পরিবারের সন্তান লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন। তাঁর আমলেই প্রবর্তিত হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তবে তিনি এর উদ্ভাবক ছিলেন না। স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপকারিতা সম্পর্কে কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার নিকট

রিপোর্ট পেশ করার ফলে ডাইরেক্টর সভা বাংলায় ঘন ঘন রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তনের ক্ষতিকর দিকগুলো নির্দেশ করে কর্নওয়ালিসকে প্রথমে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদী এবং পরে চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নির্দেশ দেয় (রায় ১৯৮৪)। সে অনুযায়ী রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও কনওয়ালিস ১৭৯০ সালে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছর মেয়াদী ভূমি বন্দোবস্ত করেন এবং ঘোষণা করেন যে ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে এ ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা হবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ঃ ১৭৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর কর্নওয়ালিস ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করলে ১৭৯৩ সালেরর ২২শে মার্চ দশ সালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষিত হয় (প্রাগুপ্ত)। এর ফলে বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা পরিশোধের মাধ্যমে জমিদারগণ চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃত হন। জমিদারীর অভ্যন্তরে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব থেকে জমিদারগণ অব্যাহতি লাভ করেন এবং এর দায়িত্ব সরকার স্বহস্তে গ্রহণ করে। শত শত বছর যাবত প্রচলিত ব্যবস্থা অর্থাৎ ভূমির উপর রায়তের অধিকার এর মাধ্যমে অস্বীকৃত হলো।

উদ্দেশ্য ঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েই এদেশ দখল করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তা যতদূর সম্ভব ইংল্যান্ডে পাচার করা। এ বিষয়ে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কোন রাখ ঢাক না করেই বলেন এ দেশের উদ্বৃত্ত রাজস্ব দেশে পাচার করাই ছিলো এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের অন্যতম লক্ষ্য (ইসলাম, ১৯৯৩)। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন অধিকতর সম্পদ সৃষ্টি। কৃষির উন্নতি না করে রাজস্ব বৃদ্ধি করলে কৃষির ধ্বংস এবং কৃষক বিদ্রোহ ছিলো অবশ্যম্ভাবী। অন্যদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের সীমাহীন লুটপাটের ফলে দেশের অর্থনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি ব্যবসায়ও কোম্পানী বিপুল পরিমাণ লোকসান দিতে থাকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে ভূমির উপর স্থায়ী অধিকার পেলে জমিদারগণ কৃষি উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবেন। যেহেতু কোম্পানীকে প্রদেয় রাজস্ব চিরস্থায়ীভাবে স্থির করা হয়েছে তাই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা জমিদারগণ লাভাবন হবেন। ফলে কৃষির উন্নয়ন হবে। দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী হবে। জমিদার কর্তৃক পুঁজি বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্রিটেনের মতো এদেশেও একটি কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হবে। তাছাড়া জমিদার সমাজ শত সুবিধার বিনিময়ে সরকারের প্রতি থাকবে অনুগত। সামাজিক শাসক হিসেবে এমনিভাবে জমিদার শ্রেণী হবে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ভিত্তি (ইসলাম, ১৯৮৭)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আরেকটি অনুক্ত উদ্দেশ্য ছিলো। এটি হলো বাংলার কৃষি নির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শিল্প নির্ভর পুঁজিবাদী সমাজে উত্তরণ ঠেকিয়ে রাখা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ) ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। এর মাধ্যমে ইউরোপে পুঁজিবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়। ১৬০০ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার পর এ কোম্পানী বাংলাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধের পর বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সহযোগী শক্তি হিসেবে একটি দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এ দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণী ইংরেজ বণিক কাম শাসকদের উচ্ছিস্ট ভোগী হিসেবে ইতোমধ্যে প্রচুর অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়। পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী এ দেশীয় পুঁজির শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গদেশকে তাদের দেশে উৎপাদিত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলো। এ অবস্থায় দেশীয় উদ্যোক্তা শ্রেণীর জন্মের মধ্যে তাদের একচেটিয়া ব্যবসার অনিবার্য অবসান নিহিত ছিলো। অন্যদিকে সমাজে পুঁজিবাদী বিকাশের সূচনা হলে পুঁজিবাদের অনুষঙ্গ হিসেবে জনগণ অধিকতর অধিকার সচেতন হয়ে দেশ থেকে বিদেশী শাসন অবসানের লক্ষে বিরামহীন আন্দোলন শুরু করতে পারে। কাজেই ব্রিটিশ শাসকগণ তাদের স্বাভাবিক বৈশ্য বুদ্ধিতে তাড়িত হয়ে বঙ্গদেশে শাসন ও শোষণের প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রবর্তন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এর ফলে দেশীয় মুৎসুদ্দী শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত সম্পদ শিল্প পুঁজিতে রূপান্তরিত না হয়ে নিলামে জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োজিত হয় এবং বাংলায় সামন্ততন্ত্রের অবসান বিলম্বিত হয়। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী নানা বিপদ আপদের সময় তাদের বিদেশী প্রভুদের সহযোগিতা করে বাংলায় আরো দেড় শতাধিক বছর ব্রিটিশ শাসন কায়েম রাখতে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (Chowdhury, 1979)। এদেশে কোম্পানী রাজত্বের শুরু থেকেই বেশ কয়েকটি কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এ কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর কাছে একটি লিপিতে বলেন, আমাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই (এ দেশের) ভূস্বামীগণকে আমাদের সহযোগী করিয়া লইতে হইবে। এ ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অর্থ হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ দমন। কৃষকদের দমনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কোম্পানীর ফৌজের উপর নির্ভর না করে তারা এমন একটি শ্রেণীর সহায়তা লাভ করতে চেষ্টা করেছিলো যাদের স্বার্থের সাথে নিজেদের স্বার্থ একই গাঁটছড়ায় বাঁধা থাকবে (উমর, ১৯৮৩)।

রীতিমত রাজনৈতিক কারণে যে কোম্পানী মুঘল আমলের জমিদারদের ধ্বংস সাধন করতে চেয়েছিলো তার প্রমাণ রয়েছে। এই সময়ে বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় পুরানো জমিদারেরা ইংরেজ শাসন পত্তনের বিরোধিতা করেন এবং তারা অনেক সময় স্থানীয় জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতেন। তাই ১৭৬০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উল্লিখিত জমিদারদের সম্পর্কে গভীর সন্দেহ পোষণ করতে থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজেও পুরনো জমিদারদের কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য সম্পর্কে গভীরভাবে সন্দিহান ছিলেন। তাই তিনি একটি বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, "বড় বড় জমিদারেরা তাঁদের প্রচন্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা একটি বাঞ্চনীয় কাজ (কবিরাজ ১৯৮০)। সুতরাং এদেশে কোম্পানীর আধিপত্য নিষ্কন্টক ও দীর্ঘস্থায়ী করার স্বার্থে এসব বিপজ্জনক জমিদারদের উৎখাত করে তাদের স্থলে একদল রাজানুগত জমিদার শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নব সৃষ্ট জমিদারদের সবারই একটি বিষয়ে মিল ছিলো আর তা হলো ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি নিরংকুশ আনুগত্য। নব সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর পারিবারিক ইতিহাস থেকেই ব্রিটিশ শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কাশিমবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের দেওয়ান। হেস্টিংসের আশীর্বাদে নাটোরের রাজার জমিদারীর কিয়দংশ আত্মসাৎ করে তিনি বিরাট জমিদারে পরিণত হন। হেস্টিংসের মুন্সী নবকিষণ প্রভুর কৃপায় প্রতিষ্ঠা করেন শোভাবাজার রাজ পরিবার (প্রাগুপ্ত)। বাংলার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার কোম্পানীর দেওয়ানী করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এঁর পুত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর প্লাউডেন সাহেবের দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে পৃথকভাবে বাণিজ্য শুরু করেন। এসব বাণিজ্যের মধ্যে নীল ও রেশম রফতানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোম্পানীর নাম ছিলো টেগোর এ্যান্ড কোঃ, তিনি ইউনিয়ন ব্যাংক এর প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে তিনিই ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাংকের একমাত্র মালিক। এ থেকেই তাঁর সম্পদের পরিমাণ কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারীর প্রায় সর্বত্রই নীলের কারখানা স্থাপন করেছিলেন (আখতার ১৯৮৭)।

বৈশিষ্ট্য ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নীতিমালায় উল্লেখ ছিলো-

খরা, বন্যা বা মহামারী কোন অবস্থাতেই জমিদারের দেয় রাজস্ব কমানো বা মওকুফ করা যাবে না। জমিদার তার দেয় রাজস্ব সময় মতো না দিতে পারলে

আংশিক বা পুরো জমিদারী বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে। (ধারা ৬, উপধারা ৭, রেগুলেশন নং১, ১৭৯৩)

কোন জমিদার প্রজার সম্পত্তি ক্রোক করতে পারবে না বা প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। দৈহিক নির্যাতন করতে পারবে না। জমিদারের অভিযোগ থাকলে সে যেন দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করে। জমিদার বা তালুকদার যদি এ আদেশ অমান্য করে এবং তাদের বিরুদ্ধে যদি প্রজা অভিযোগ করে তবে দোষী সাব্যস্ত হলে জমিদারকে প্রজার মামলার খরচ বহন করতে হবে। (ধারা ৩, ৪, ৫, ২৮ রেগুলেশন নং ৭, ১৭, ১৭৯৩)

ন্যায্য খাজনা ছাড়া কোন প্রকার কর বা আয়কর আদায় চলবে না। এখন থেকে জমিদারকে প্রজাদের পাট্টা দান করতে হবে উক্ত পাট্টায় পরিস্কারভাবে খাজনার পরিমাণ উল্লেখ থাকতে হবে। প্রজাদের উপর শোষণের কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে জমিদারকে বে আইন অর্থ আদায়ের তিনগুণ দিতে হবে। (ধারা ৫ ঃ রেগুলেশন ৮ ও ধারা ৫৭ উপধারা১, রেগুলশেন নং৮, ১৭৯৩)।

জমিদারদের অধীনস্থ তালুকদারদের এখন থেকে আলাদা করে গণ্য করা হবে এবং তাদের সাথে আলাদাভাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হবে। (ধারা ৫, রেগুলেশন ৮, ১৭৯৩০ (হক ১৯৮৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে কাগজে কলমে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষকদের পক্ষে অনেকটা অনুকূল ছিলো, যদিও বাস্তবে কৃষকেরা এসব আইনের সুফল পায়নি বললেই চলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ছিলো 'সূর্যাস্ত আইন'। এ আইন অনুযায়ী জমিদারগণকে একটি নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারকে দেয় খাজনা পরিশোধ করতে হতো। এর কোনরূপ অন্যথা হলে জমিদারের জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হতো। এ বিষয়ে সরকার কখনোই কোন ধরণের ছাড় দিতেন না। ফলে প্রথমদিকে নিয়মকানুন সম্বন্ধে অজ্ঞ জমিদারগণ এ আইনের মাধ্যমে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

মুঘল যুগের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ব ভোগীর কোন স্থান ছিলো না। কারণ সে ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে মাতব্বরদের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী পর্যায়ের একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী ছাড়াও ধাপে ধাপে আরও অনেক ধরণের মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর জন্ম। এই মধ্যস্বত্ব

ভোগীরা মূল জমিদারদের পক্ষ থেকে জমিদারী দেখাশোনার ভারপ্রাপ্ত হতো এবং জমিদারদের দেয় রাজস্ব ও জমিদারদের থেকে তাদের পাওনা বাদ দিয়ে অতিরিক্ত আদায় দ্বারা নিজেদের উদরপূর্তি করতো (উমর, ১৯৮৩)।

উইলিয়াম হান্টারের অনুসরণে অনেকে মনে করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদার সব ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের স্থান দখল করে হিন্দু পুঁজিপতিগণ। ঐতিহাসিকভাবে এধারণা অযৌক্তিক। মুঘল আমল থেকে ভূমি প্রশাসনে হিন্দুদের ছিলো একচেটিয়া আধিপত্য আর মুসলমানদের ছিলো বিচার বিভাগে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে ছয়টি বৃহৎ জমিদারীর মধ্যে একমাত্র বীরভূমের রাজা ছিলেন মুসলমান। বাকী সবাই হিন্দু। ক্ষুদ্র জমিদারদের মধ্যেও বেশীর ভাগ ছিলেন হিন্দু যে যৎসামান্য জমিদার ছিলেন মুসলমান তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন অতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র জমিদারগণ সূর্যাস্ত আইনে খুব কমই ক্ষতিগ্রস্ত হন (ইসলাম, ১৯৮৭)। প্রকৃতপক্ষে হিন্দু এবং মুসলমানদের পরস্পরের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে, তাদরে মধ্যে বিবাদ, বিসংবাদ জীইয়ে রেখে এদেশে ব্রিটিশ শাসন নির্বিঘ্ন এবং দীর্ঘস্থায়ী করাই ছিলো এহেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচারের মূল কারণ। উইলিয়াম হান্টার তাঁর বহুল আলোচিত গ্রন্থ Indian Mussalmans-এ মন্তব্য করেছেন, একশত বছর পূর্বে এদেশে কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া ছিলো অসম্ভব। অথচ বর্তমানে কোন মুসলমানের পক্ষে ধনী হওয়া অসম্ভব (Hunter, 1982)। এটা যে অতিশায়াক্তি তা বুঝতে কষ্ট হয় না কারণ এদেশে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণ জনগণ সব সময়ই ছিলো অত্যাচারিত। শুধুমাত্র স্বধর্মী হওয়ার কারণে কোন প্রজা রাজা বা জমিদারের অত্যাচার থেকে রেহাই পায়নি। হান্টার সাহেবই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বালাকোটের শহীদ সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীকে 'দৃষ্কৃতকারী' আখ্যায়িত করেছেন (প্রাগুপ্ত)। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি হান্টার সাহেবের এহেন সহানুভূতি যে কুম্ভীরাশ্রু ছাড়া আর কিছু নয় বরং এটা যে ব্রিটিশ শাসকদের Divide and Rule নীতির মাধ্যমে এদেশবাসীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার পরিকল্পনার অংশ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ফলাফল ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ছিলো বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়দিকই ছিলো। এ ব্যবস্থার পক্ষে রামমোহন রায় বলেন; এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে জমির উন্নতির দিকে জমিদারদের নজর পড়েছে বহু পতিত জমি জমিদারদের উদ্যোগে কর্ষণযোগ্য হয়ে উঠেছে। জমির মূল্য বহুগুণ বেড়েছে। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে

তিনি বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের যে একতরফা সুবিধা দেয়া হয়েছে, তাতেই কৃষকের দুর্দশা বেড়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকের উপর খাজনার ভার লাঘব করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত (কবিরাজ ১৯৮০)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনিবার্য ফল হলো বাংলার কৃষক সমাজের সর্বনাশ। এ ব্যবস্থার ফলে কৃষক (রায়ত) জমিতে তার স্বত্ব হারায়। মুঘল যুগে স্থায়ী রায়তদের জমিতে স্থায়ী অধিকার ছিলো। জমিদারের পক্ষে খাজনা বৃদ্ধি করা বা রায়তকে জমি থেকে উৎখাত করা ছিলো অসম্ভব। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রায়ত পরিণত হয় জমিদারের ইচ্ছাধীন প্রজায়। জমি পরিণত হয় জমিদারের সম্পত্তিতে। জমিদার ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি এবং রায়তকে জমি থেকে উৎখাত করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। বাংলায় জমিদারদের কাছ থেকে সরকার খাজনা পেতো একর প্রতি দশ আনা আট পয়সা হারে অথচ জমিদারগণ বে আইনী আদায় বাদ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো একর প্রতি তিন টাকা হারে অর্থাৎ সরকারকে যা দিতো তার পাঁচগুণ। ঊনবিংশ শতকের শুরু থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলে জমির উপর জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পায়। এ সুযোগে জমিদারগণ ইচ্ছামতো খাজনা বৃদ্ধি করতে থাকে। অপদার্থ জমিদারগণ নিজেদের জমিদারীর কার্য সম্পাদনে অক্ষম হওয়ায় নিয়োগ করে একদল মধ্যস্বত্ব ভোগী। প্রজাদের উপর নির্যাতনে এরা জমিদারদের ছাড়িয়ে যায়। সমস্ত ঊনিশ শতক এবং বিশ শতকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ইতিহাসে এই অতিরিক্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা উত্তরোত্তরভাবে বৃদ্ধি লাভ করে এদেশে নিয়মিতভাবে খাদ্য সংকট, মহামারী, দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদের জমি থেকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে উচ্ছেদ করে তাদের পরিণত করেছে ভূমিহীণ কৃষক ও গ্রাম্য দিন মজুর শ্রেণীতে (উমর, ১৯৮২)। মীর মোশারফ হোসেন 'জমিদার দর্পণ' নাটকে বলেছেন, আচ্ছা মফস্বলে এক রকমের জানোয়ার আছে জানেন? তারা কেউ কেউ জানে যে এ জানোয়ার বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় নম্র; হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মনে দ্বিধা নাই, মাছ মাংস ছোঁয়না। কিন্তু মফস্বলে শ্যাল, কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না। বলব কি জানোয়ারেরা আপন আপন বনে গিয়ে বাঘ হয়ে বাস করে। এই জানোয়ারেরা আবার দুই দল, যেমন হিন্দু আর মুসলমান (কবিরাজ ১৯৮০)। জমিদারদের একটা বিরাট অংশ বসত করে মহানগর কলকাতায়। কৃষকের রক্ত জল করা অর্থে এরা মত্ত হয় সীমাহীন বিলাস ব্যসনে। দেশের অধিকাংশ জনগণ যখন

জমিদারের খাজনা পরিশোধের অর্থ যোগাতে প্রাণপাত করছে এবং দারিদ্রের পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তখন এ পরজীবী শ্রেণী ঘুড়ি ওড়ানো, পায়রা ওড়ানো, বিড়ালের বিয়ে ইত্যাদি তুচ্ছ কাজে খরচ করতে থাকে লক্ষ লক্ষ টাকা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তিন কোটি টাকা খরচ করে বিলাত ভ্রমণ করেছিলেন (সুনীল, ১৯৮৮)। এ অর্থ যে দরিদ্র, নিরন্ন প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। নবসৃষ্ট এ জমিদার শ্রেণী সম্পর্কে সাহিত্য সম্রাট বংকিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমাদের দেশের এখনকার বড় মানুষদিগকে মনুষ্যজাতির মধ্যে কাটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি বড় আঁট, কতকগুলি কেবল ভুতুড়ি সার, গরুর খাদ্য (কবিরাজ ১৯৮০)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শুরুতে বঙ্গদেশের ভূমি ব্যবস্থায় দেখা দেয় বিরাট সংকট। সূর্যাস্ত আইনের প্রয়োগের ফলে বড় বড় জমিদারীগুলি দ্রুত নিলামে বিক্রি হতে থাকে। নাটোর, দিনাজপুর, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি বড় বড় জমিদারী প্রথম দশ বছরের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। একমাত্র বর্ধমানের জমিদার ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পান। ১৮২০ সাল নাগাদ বাংলার প্রায় অর্ধেক জমিদারী ভূমি নিলামের মাধ্যমে হাত বদল হয় (ইসলাম, ১৯৯৩)। হাত বদলের মাধ্যমে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ায় জমিদার শ্রেণীতে এলো রূপান্তর। পূর্বের রাজা, মহারাজা উপাধিধারী জমিদারদের স্থলাভিষিক্ত হলো নতুন এক শ্রেণী যারা আগে ছিলেন ব্যবসায়ী, সরকারী ও জমিদারির কর্মচারী। এরা প্রধানত সামাজিক মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যেই ভূমি নিয়ন্ত্রণে যোগদান করেন। প্রজা পীড়নে পূর্বসুরিদের তুলনায় এরা ছিলেন অধিকতর নিষ্ঠুর। তাদের স্থায়ী ঠিকানা ছিলো শহরে। আর তাদের এস্টেট পরিচালনা করতেন নায়েব গোমস্তারা, গ্রামীন সম্পদ পাচার হয়েছে শহরে, বেড়েছে গ্রামীন দারিদ্র (প্রাগুপ্ত)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবশ্যাম্ভাবী ফলাফল হলো অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ। নবসৃষ্ট জমিদার এবং তাদের আমলা, গোমস্তাদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার কৃষক-জনতা তাদের ক্ষোভের সরব প্রকাশ ঘটিয়েছে বিদ্রোহের মাধ্যমে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একদিকে যেমন এই জমিদার শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিলো অপরদিকে তেমনি তা জন্ম দিয়েছিলো অসংখ্য কৃষক সংগ্রামের, যে সব সংগ্রামের মূল চরিত্র ছিলো গণতান্ত্রিক (উমর ১৯৮২)। কোন এলাকায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রথমে জমিদার তা দমনের চেষ্টা করতেন। জমিদার ব্যর্থ হলে পুলিশ বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী ব্যর্থ হলে সেনাবাহিনী তলব করা হতো। এ সময়ে সংঘটিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ হলা তিতুমীরের বিদ্রোহ, মজনু শাহের নেতৃত্বে

ফকির বিদ্রোহ, ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, নূরল দীনের নেতৃত্বে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, সন্দ্বীপ বিদ্রোহ, চাকমা বিদ্রোহ, বলাকী শাহের বিদ্রোহ ইত্যাদি। মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক সমসাময়িক ছিলেন। এক পর্যায়ে উভয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনা করেন (ইলিয়াস, ১৯৯৮)। বিদ্রোহগুলোর মধ্যে কোন কোনটি ছিলো জমিদারদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফুর্ত স্থানীয় প্রতিবাদ।

এদেশে ব্রিটিশ শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী এবং নিষ্কন্টক করার বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসেবে শাসক শ্রেণী পেয়েছিলো জমিদার শ্রেণীকে। বিশেষ করে কৃষক বিদ্রোহ দমনে জমিদার শ্রেণী উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে ব্রিটিশ সরকারের কাজের ভার অনেকটা লাঘব করে দেয়। এ সম্পর্কে গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮২৯ সালে ঘোষণা করেন, আমি এটা বলতে বাধ্য যে, ব্যাপক গণ বিক্ষোভ অথবা গণ বিপ্লব থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষভাবে ফলপ্রসু হয়েছে। অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে, এমনকি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যর্থ হলেও এর ফল এমন এক বিপুল সংখ্যক ধনী ভূস্বামী শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যারা ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখতে বিশেষভাবে আগ্রহশীল এবং জনগণের ওপর যাদের অখন্ড প্রভুত্ব বজায় আছে (উদ্ধৃত উমর ১৯৮২)। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ শুরু হলে এ শ্রেণী তাদের বিদেশী প্রভুদের দান করে সর্বাত্মক সহযোগিতা। এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশের জয়লাভে জমিদারদের সহযোগিতা পালন করে নির্ধারক ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশের বংশবদ এ লাঠিয়াল শ্রেনীর (কিছু ব্যাতিক্রম বাদে) অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই ১৮৫৭ সালের মহাপ্রলয় থেকে এ দেশের ব্রিটিশ শাসন রক্ষা পায়। এ মহান সংগ্রামে ঢাকার নবাব আবদুল গণি, ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী যশোরের বরদাকান্ত রায়, চট্টগ্রামের কালিন্দী রাণী, রংপুরের রাণী স্বর্ণময়ী দেবী, পাবনার বিজয়গোবিন্দ চৌধুরী, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, নোয়াখালীর যশোদাকুমার পাইন, সৈয়দ আমীর আলী, গৌরাঙ্গ চন্দ্র রায়, খোদা বক্স শাহ, খেদমত শাহ ফকির ও ইয়াসিন শাহ ফকির অকুণ্ঠ চিত্তে এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের বিদেশী প্রভুদের এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে সহায়তা করেন। প্রকৃতপক্ষে উল্লিখিত জমিদারগণসহ বাংলার অধিকাংশ জমিদার ব্রিটিশ প্রভুদের সহযোগিতার বিষয়ে পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৬শে মে রাজা রাধাকান্তদেব এর সভাপতিত্বে কলকাতা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক সভায় বিদ্রোহীদের কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা এবং ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি সর্বাত্মক

সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় শুরু হয় ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলন যা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনে ব্রিটিশ শাসনের ভিত কেঁপে ওঠে। এ ক্ষেত্রেও জমিদার শ্রেণী তাদের প্রভুদের দান করে সহযোগিতা। কোন কোন জমিদার বিপ্লবীদের ধরিয়ে দিতে পালন করেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এ বিষয়ে বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো বলেন, এ কাজে সরকারী ছোট বড় কর্মচারীদের মধ্যে এমনকি পুলিশের কাছেও বরং সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু জমিদার শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে কম সাড়া পেয়েছি (উদ্বৃত উমর ১৯৮২)। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু হলে বঙ্গীয় জমিদার সংঘের সভাপতি গভর্ণর জেনারেলের উদ্দেশে বলেন মহামান্য বড় লাট বাহাদুর! আপনি জমিদার দিগের পূর্ণ সমর্থন ও বিশ্বস্ত সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন (প্রাগুপ্ত)। এ অঙ্গীকার উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত রক্ষা করা হয়েছিলো।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে ভূমি রাজস্ব খাতে সরকারের আয় চিরদিনের মতো নির্দিষ্ট হয়ে যায় অন্যদিকে জমিদারগণ সময় সময় রাজস্ব বৃদ্ধি করে নিজেদের আয় বাড়িয়ে চলছিলো। ১৮৮০ সালের এক হিসেবে দেখা যায় যে সে বছর ভূমি রাজস্ব থেকে বাংলার জমিদারের আয় করেছিলো দুকোটি পাউন্ড অন্যদিকে সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে মাত্র চল্লিশ লক্ষ পাউন্ড (প্রাগুপ্ত)। অনেকে মত প্রকাশ করেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বঙ্গদেশের কৃষিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি তা নয়। কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সমপরিমাণ জমিতে অধিক ফসল ফলানো এবং উদ্বৃত্ত ফসল লাভজনকভাবে বাজারজাত করার ব্যবস্থাকে বলা হয় কৃষির উন্নয়ন। অন্যদিকে কৃষি কৌশলের উন্নয়ন না ঘটিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনয়ন করাকে বলা হয় কৃষি সম্প্রসারণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রকৃতপক্ষে এদেশে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটেছিলো। এর ফলে দেশ দীর্ঘদিন দুর্ভিক্ষমুক্ত থেকেছে। তবে এ কৃতিত্ব কৃষক সমাজের, জমিদারদের নয়। ঐতিহাসিক ও দার্শনিক জেমস মিল এর ভাষায় রায়তের হাতে পুঁজি সৃষ্টিতে জমিদারি ব্যবস্থা সহায়ক হয়েছে এমন ধারণা আমি করতে পারি না। আমাদের কাছে পরিষ্কার প্রমাণ রয়েছে, অধুনা যে কৃষির সম্প্রসালন ঘটেছে এর জন্য দায়ী কৃষক, জমিদার নয় (উদ্বৃত ইসলাম ১৯৯৩)। তৎকালীন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সদস্য হেনরি নিউনহ্যাম বলেন বাংলায় কৃষি সম্প্রসারন কর্মকান্ড সংঘটিত হয়েছে কৃষক শ্রমিক কর্তৃক। জমিদারের ভূমিকা এখানে শুধু কৃষককে

উচ্চহারে চক্রবৃদ্ধি সুদে সামান্য ঋণ দেয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। জঙ্গল পরিষ্কার করে জনপদ সৃষ্টি করা, পুকুর কাটা, জলাশয় নির্মাণ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করেছে কৃষক-শ্রমিক (প্রাগুপ্ত)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে সংঘটিত ব্যাপক কৃষি সম্প্রসারণের সিংহভাগ কৃতিত্বের দাবীদার কৃষক সমাজ, জমিদার শ্রেণী নয়।

১৭৬৫ সালে প্রধানত ইংল্যান্ডকে কেন্দ্র করে সূচিত শিল্প বিপ্লবের প্রভাব থেকে বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন রাখা অর্থাৎ শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজি বিনিয়োগ বন্ধ করে বাংলার শিল্প খাতকে স্থবির রেখে এখানে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার অক্ষুন্ন রাখতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ছিলো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ব্রিটিশ সরকার দেশীয় শিল্প থেকে প্রাপ্ত মুনাফার উপর আয়কর ধার্য করে কিন্তু জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় ছিলো করমুক্ত। এমতবস্থায় বাংলার ধনিক শ্রেণী তাদের হাতে সঞ্চিত বিনিয়োগযোগ্য অর্থ শিল্প স্থাপনে ব্যয় না করে জমিদারী ক্রয়েই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যয় করে। কারণ জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় ভোগ করা যেতো নিরুপদ্রবে এবং এ খাতে মুনাফাও ছিলো শিল্প স্থাপনের চেয়ে বেশী। উপরন্তু শিল্প স্থাপনে অনেক সময়ই লোকসানের ঝুঁকি থেকে যায়। বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উদ্যোক্তা শ্রেণীর উদ্ভবের স্বল্পতা সম্পর্কে গবেষক বিনয় ঘোষ সমসাময়িক পত্রে বাঙ্গালার সমাজচিত্র পুস্তকে লিখেছেন, এই নতুন ধনিক শ্রেণীর কাছে জমিদারী ও বাণিজ্য পণ্যের মতো লেনদেনের স্পেকুলেশন ও মুনাফার বস্তু হয়ে উঠল। বস্তুত কর্ণওয়ালিসেরও উদ্দেশ্য ছিলো তাই। এ দেশের নতুন ধনিক শ্রেণীর সঞ্চিত ধনের একটা গতি করা প্রয়োজন। জমিদারীতে নিরাপদ আয় এবং অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ সৃষ্টি করে কর্ণওয়ালিস এ দেশের নতুন বাণিজ্য লব্ধ মূলধনকে স্বাধীন শিল্পায়নের ক্ষেত্র থেকে সনাতন ভূসম্পত্তির দিকে পরিচালিত করেছিলেন (উমর ১৯৮৩)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী শুধুমাত্র কৃষক শোষণ, নজীরবিহীন অনাচার এবং বিদেশী প্রভুদের সেবাদাস বৃত্তির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাদের ইতিবাচক কর্মকান্ডের ফিরিস্তিও কম লম্বা নয়। এদেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তারা একটি শক্তিশালী বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিত্তি রচনায় ইতিবাচক অবদান রাখেন। বাংলার অসংখ্য স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অনেক জমিদার অর্থ, জমি ইত্যাদি দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন।

এদেশের বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটা বড় অংশের প্রতিষ্ঠাতা

প্রকৃতপক্ষে জমিদারগণই। ঢাকাবাসীদের পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ পালন করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রজা অন্তঃপ্রাণ। তিনি প্রজা সাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য গোল আলুর চাষ, আধুনিক কৃষি উপকণের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের গবাদিপশু পালনে প্রজাদের উৎসাহিত করেন। তিনি নোবেল পুরস্কার লব্ধ অর্থের কিয়দংশ চাষীদের মাঝে সহজ শর্তে ঋণ হিসেবে বিতরণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদেশে ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন প্রচেষ্টার পথিকৃৎ। বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী সিল্কের প্রচার ও প্রসারে তিনি পালন করেন অবিস্মরণীয় ভূমিকা (সুণীল ১৯৯৬)। প্রজা সাধারণের সুবিধার জন্য অনেক জমিদার খনন করেন অসংখ্য পুকুর, দীঘি, খাল এবং নির্মাণ করেন অজস্র মসজিদ, মন্দিরসহ নানা ধরণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দিকে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকারীদের রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করে। ফলে উপাধি লাভে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক জমিদার স্কুল কলেজ স্থাপন করেন। ১৯২০ সনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে দেশের সব কয়টি স্কুল কলেজের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগই ছিলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত (ইসলাম ১৯৮৭)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রধানত কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার যে রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা হয় তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নবোত্থিত জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে কলকাতা শহরে। এদের একাংশ কালক্রমে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মুক্তবুদ্ধি চর্চায় নিয়োজিত হয় ও এতে পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার দমনে সরকারী প্রচেষ্টায় এরা সমর্থন দান করে। শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে স্থাপিত হয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান এবং এগুলোতে জমিদারদের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিলো। ১৮১৫ সালে বাল্য বিবাহ, জাতিভেদ, সতীদাহ, বহু বিবাহ ইত্যাদি সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় স্থাপন করেন আত্মীয় সভা। গোপীমোহন ঠাকুর, তৎপুত্র প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, তেলেনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়, টাকীর কালীনারায়ণ রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ জমিদার এর সঙ্গে যুক্ত চিলেন। ১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যানুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জনার্থে কলকাতায়

স্থাপিত হয় গৌড়ীয় সমাজ। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ, রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ভূস্বামী। ১৮৩৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে মুক্তবুদ্ধি চর্চার লক্ষ্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখের অভ্যুদয় হয় এ পত্রিকার মাধ্যমে (আখতার ১৯৮৭০। ভারতে প্রথম আধুনিক পুরুষ রাজা রামমোহন রায় তার যুগান্তকারী একেশ্বরবাদী মতবাদের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠা করেন ব্রাহ্ম সমাজ। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্ম মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ বেশ কয়েকজন জমিদার এবং মুক্ত বুদ্ধির সমর্থক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

অন্যদিকে রাজা রামমোহনের মতবাদের বিরোধিতা করে হিন্দু সমাজের রক্ষণশীল অংশের পক্ষ থেকেও শুরু হয় রামমোহন বিরোধী বিরামহীণ অপ্রচার। ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রসার রোধ করার জন্য রাজা রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১৮৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্মসভা। কিন্তু ব্রাহ্ম আন্দোলনকে ঠেকিয়ে রাখা যায়নি।

বাংলার রাজনীতিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রকৃতপক্ষে শেরে বাংলা ফজলুল হক, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশের রাজনীতির মূল নিয়ন্ত ছিলো জমিদার শ্রেণীই। ১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। শুরু থেকেই বাংলার জমিদার শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলো। এক সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন একেক বছর বাংলার একেক স্থানে অনুষ্ঠিত হতো এবং আয়োজক হিসেবে থাকতেন স্থানীয় জমিদার। ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। প্রথমদিকে মুসলিম লীগকে বলা হতো নবাব-নাইটদের পকেট সংগঠন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ আঁন্দোলনে জমিদার শ্রেনীর একাংশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনেক জমিদার তাদের জমিদারীতে বিলাতি পণ্য বিক্রয় বন্ধ করে দেন। ১৯০৬ সালের বেঙ্গল পুলিশ রিপোর্টে দেখা যায় যে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে মহারাজ সূর্যকান্ত ১০ হাজার টাকা, মহারাজ মনীন্দ্র নন্দী ৫ হাজার টাকা, মহারাজ টি পালিত ৫ হাজার টাকা, মহারাজ জানকী রায় ৫ হাজার টাকা, গজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫ হাজার টাকা, সন্তোষ ব্রাদার্স ৩ হাজার টাকা, দিঘাপাতিয়ার মহারাজ ২.৫ হাজার টাকা, সোবহান

চৌধুরী ১ হাজার টাকা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১ হাজার টাকা এবং নাটোরের মহারাজ ১ হাজার টাকা চাঁদা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন (আখতার, ১৯৮৭)। নবাব সলিমুল্লাহ, নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করে এর সপক্ষে প্রচারণা চালান। বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের বিনিময়ে নবাব সলিমুল্লাহর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্ন থেকে প্রধানত বাঙারী হিন্দু যুবকদের মধ্যে সশস্ত্র পন্থায় এদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে আন্দোলনের সূচনা হয়। এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীগণ অগ্নিযুগের বিপ্লবী হিসেবে খ্যাত। ব্রিটিশ বিরোধী এ সশস্ত্র আন্দোলনে জমিদার পরিবারের অনেক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। হুগলীর জমিদার পরিবারের সন্তান নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অর্থ সাহায্য প্রদান করেন। পুলিশের হাতে ধৃত হওয়ার পর তিনি রাজসাক্ষী হওয়ায় সহযোগী বিপ্রবী কানাই লাল ও সত্যেন্দ্রনাথ ১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর নরেন্দ্রনাথকে কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করেন। বিচারে উভয় বিপ্লবীর ফাঁসি হয় (ওয়ালিউল্লাহ ১৯৬৯)। জনশ্রুতি আছে যে ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী এবং গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সশস্ত্র বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতেন (আখতার ১৯৮৭)।

মুঘল আমল থেকেই বাংলার অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট অধিকাংশ জমিদারও ছিলেন হিন্দু। কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদ দিলে চরিত্রগতভাবে অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন অত্যাচারী। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এ পরিস্থিতিকে মুসলমানদের উপর হিন্দুদের অত্যাচার হিসেবে চিত্রিত করে প্রচারণা চালায় এবং এতে সফলও হয়। অথচ চরিত্রগত দিক দিয়ে হিন্দু এবং মুসলমান জমিদারদের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিলো না। জমিদারগণ ধর্মীয় কারণে নয় বরং শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থ করতেই প্রজাপীড়ণ চালিয়েছে। হিন্দু জমিদারের অত্যাচার থেকে হিন্দু প্রজা এবং মুসলমান জমিদারের অত্যাচার থেকে মুসলমান প্রজা ধর্মীয় কারণে রেহাই পেয়েছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের অন্যতম কারণ ছিলো জমিদার শ্রেণীর প্রজাপীড়ণ এবং তার উদ্দেশ্যমূলক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা।

উপসংহার ঃ ১৯৫১ সালে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার কর্তৃক জারীকৃত এক আইন বলে তৎকালীন পূর্ব বাংলা থেকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে দেড় শতাধিক বছর যাবত চলমান চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটে। উক্ত আইনে

চা বাগানসহ বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত কোন পরিবারের দখলে সর্বোচ্চ ৩৭৫ বিঘা জমি রাখার আইন জারী করা হয়। ফলে বঙ্গদেশের কৃষক জমিদারদের হাত থেকে রক্ষা পায়। তবে তাদের অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। বেনামে নির্ধারিত সীমার চেয়ে অনেক বেশী জমি দখলে রাখা জোতদার শ্রেণী কৃষকদের উপর জেঁকে বসলো। শোষণ নির্যাতনে অনুপস্থিত জমিদারদের তুলনায় এরা ছিলো অধিকতর নৃশংস। নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে এক নামে ভোগদখলযোগ্য জমির সর্বোচ্চ সীমা ৬০ বিঘা। এতোসব পরিবর্তনের পরও বাংলাদেশের কৃষক শ্রেণীর অবস্থার যে বড় ধরণের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতিকে আমূল প্রভাবিত করে। এ প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রকারেই ছিলো। জমিদারদের শোষণ-নির্যাতনে কৃষক সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অনেক কৃষক এর ফলে পরিণত হয় ভূমিহীণ ক্ষেত মজুর এমনকি দস্যুতে। কৃষক বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিলো জমিদারী অত্যাচার। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় সামন্ততান্ত্রিক যুগ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং পুঁজিবাদের বিকাশ বিলম্বিত হয়। এ সবই ঐতিহাসিকভাবে সত্য। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলায় ধীরে ধীরে বিকশিত হতে শুরু করে একটি শিক্ষিত, সচেতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এ শ্রেণীর বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে প্রধানত জমিদাগরণ কর্তৃক স্থাপিত অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধীরে ধীরে সংগঠিত হয়ে এদেশে সূচনা করে ব্রিটিশ বিরোধী অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের। এ দেশ থেকে ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কার্ল মার্কসের মতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এ দেশে এক নীরব সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো (উমর ১৯৮৬)। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিম চন্দ্র চট্রোপাধ্যায় বাংলায় কৃষক সমাজের প্রতিভু হিসেবে হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্তের ভাগ্যের পরিরবতর্ন না ঘটায় আক্ষেপ করেছিলেন। ব্রিটিশ শাসন এখন এদেশে আর নেই। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছে অর্ধ শতাব্দী আগে। সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্থাপিত অলীক রাষ্ট্র পাকিস্তানী কাঠামো ভেঙ্গে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু এখনো বংকিম কথিত সেই হাশিম শেখ ও রামা কৈবর্তদের দুর্ভাগ্যের রজনীর হয়নি অবসান। বাঙালী হিসেবে এটা আমাদের জাতীয় লজ্জা। তবে রাতারাতি এ অবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন ভূমি আইনের যথাযথ প্রয়োগ, ভূমিহীনদের মাঝে খাস জমি বন্টন এবং জনঘনিষ্ঠ, বাস্তবভিত্তিক ও দূরদৃষ্টিপ্রসূত সরকারী নীতিমালা ও তার বাস্তবায়ন।

তথ্য নির্দেশিকা

ইলিয়াস, আখতারুজ্জামান (১৯৯৮) ***খোয়াবনামা,*** ঢাকা ঃ মাওলা ব্রাদার্স।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) ১৯৯৩ ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** ঢাকা ঃ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, সিরাজুল (১৯৮৬) *আঠারো-উনিশ শতকে কৃষক বিদ্রোহের রাজনৈতিক চরিত্র।*

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৭) *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক,* কলকাতা ঃ চিরায়ত প্রকাশন।

ওয়ালিউল্লাহ, মোহাম্মদ (১৯৬৯) ***আমাদের মুক্তি সংগ্রাম,*** ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

কবিরাজ, নরহরি (১৯৮০) ***স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা,*** ঢাকা ঃ বাণী প্রকাশ।

গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল (১৯৯০) ***সেই সময়,*** কলকাতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

সিরাজুল ইসলাম, আব্দুর রহিম, এবিএ মাহমুদ এ এম চৌধুরী (১৯৮৭) ***বাংলাদেশের ইতিহাস,*** ঢাকা ঃ নওরোজ কিতাবিস্তান।

রায়, অতুলচন্দ্র (১৯৮০) ***ভারতের ইতিহাস*** (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা ঃ মৌলিক লাইব্রেরী।

হান্টার, ডব্লিউ ডব্লিউ (অনুবাদ এম আনিসুজ্জামান, নতুন সংস্করণ ১৯৮২) **দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস,** ঢাকা ঃ খোশরোজ কিতাবমহল।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র (বাংলা ১৩৮১) ***বাংলাদেশের ইতিহাস আধুনিক যুগ,*** কলিকাতা ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিমিটেড।

হক, মেসবাহুল (১৯৮৪) ***পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ,*** ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

মুকুল, এম আর আখতার (১৯৮৭) ***কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি,*** ঢাকা ঃ সাগর পাবলিশার্স।

Chowdhury, Lutful Hoq (1979) ***Social Change and Development Administration,* Dhaka** : NIPA.

ISSN 1605-2021 লোকপ্রশাসন সাময়িকী
অষ্টাদশ সংখ্যা, মার্চ ২০০১, চৈত্র ১৪০৭

আধুনিক লোক প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের অকার্যকারিতা ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন *

Modern Public Administration and Ineffectiveness of Bureacracy Theory and Practice : Bangladesh Perspective

Mohammad Zulfikar Hossain

Abstract : Public administration is almost synonymous with bureaucracy. Bureaucracy is inevitable in this modern world. Bureaucracy refers to the formal rational organization of relations among persons vested with administrative authority. Bureaucrats of the new public administration implements the policies and their main obligation is to ensure economy, efficiency and equity. It is widely believed that these policies fall short the owing to scarcity of resources and poor implementation by the bureaucracy. There is a great gap between theory and the practice. It is necessary to know the activities inside the new public administration and their impact on the people. A great gap exists between what should be and what is practically happening in a developing country like Bangladesh. It is difficult to relate our public administrative system and public administration movement.

আধুনিক কালে সরকারী অথবা বেসরকারী সকল সংগঠনকে তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য যথার্থ ও কার্যকরী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। প্রশাসনিক কলাকৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করার উপর নির্ভর করে সংগঠনের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা। লোক প্রশাসন বা সরকারী প্রশাসন প্রশাসনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রেরই অংশ বিশেষ। গ্রীক দার্শনিক Aristotle এ বিষয়ে আজ থেকে দুই হাজার বৎসরেরও অধিক সময় পূর্বে বলেছেন, " It is by no means easy for one man to superinted many things : he will have to appoint a number of subordinates." উপর্যুক্ত উক্তিটির

* প্রভাষক, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাঝে নিহিত রয়েছে লোক প্রশাসনের গুরুত্ব । বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক চর্চার মাঝে ও পর্যায়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে লোক প্রশাসন প্রয়োগ এবং চর্চার ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যে সমস্ত দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করে সেখানে লোক প্রশাসন চর্চার ক্ষেত্রে একটি জবাবদিহিমূলক পরিস্থিতি বিরাজ করে। কিন্তু অনুন্নত এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক চরিত্র সম্বলিত দেশগুলোতে লোক প্রশাসনের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাচারী এবং এই পরিস্থিতিতে স্বভাবতই লোক প্রশাসনের তত্ত্বীয় ধ্যান ধারণা প্রয়োগের ব্যাপারে প্রশাসনিক অঙ্গ সংগঠনগুলোর নেতিবাচক ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

১৮৮৭ সালে প্রকাশিত 'The study of Administration' প্রবন্ধে Woodraw Wilson এক পৃথক প্রশাসন শাস্ত্রের কথা বলেন। তার মতে প্রশাসনের ক্ষেত্র হল কারবার ক্ষেত্র। তা রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্ত থেকে অনেক দূরে এবং অধিকাংশ ব্যাপারে সাংবিধানিক ক্ষেত্র থেকে পৃথক। প্রশাসন রাজনীতির যথার্থ পরিধির বাইরে। রাজনীতি প্রশাসনের কার্যাবলী নির্ধারণ করলেও তার কাজ নিয়ন্ত্রণ করে না। নিকোলাস হেনরী তার গ্রন্থ "Public Administration and Public Affairs' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে লোক প্রশাসন পাঁচটি paradigm এর মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৯৭১ সনে Dwight Waldo' র প্রকাশিত 'The New Public Administration : The Minnowbrook Perspective' নব প্রশাসন আন্দোলনের একটি ফলাফল। ডোয়াইট ওয়ালডো'র নেতৃত্বে নিনোব্রুক (Ninnowbrook) সমবেতভাবে সনাতন জন প্রশাসন ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্র বিজ্ঞানের স্বীকৃত সূত্রগুলি চ্যালেঞ্জ করেন। রাষ্ট্র বিজ্ঞানমুখী জন প্রশাসনের ২টি গ্রন্থের জন্ম হয় যা জন প্রশাসনে নব দিগন্তের সূচনা করে। জন প্রশাসনের মৌলিক মূল্যবোধগুলো ছিল representativeness, politically neutral competence, executive leadership এবং যে সকল উদ্দেশ্যে জন প্রশাসনের সূচনা তা হল দক্ষতা, মিতব্যয়িতা অর্জন এবং স্পষ্টতই এর লক্ষ্য ছিল উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা। কিন্তু নব্য লোক প্রশাসন ধারণা তার সাথে equity ধারণাটিকে সংযোজন করে। আধুনিক লোক প্রশাসন সমতার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।

উন্নয়নশীল দেশে রাষ্ট্র ব্যবস্থা একটি বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার জন্য এবং কেবলমাত্র নিজস্ব লক্ষ্য অর্জনেই ব্যস্ত। দেশের এক বিরাট অংশ সে সব সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং বেকার সমস্যা, অজ্ঞতা, হতাশা, দারিদ্র এর অন্যতম ফলাফল। বলা হয়ে থাকে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি 'সর্বাধিক সামাজিক

সুবিধার নীতি' যা নব লোক প্রশাসনের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত এবং এই নীতি কার্যকর করার জন্য যে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র তার নাম আমলাতন্ত্র। আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে কাঠামোগত কাঠিন্য ছাড়াও এর সদস্যদের মধ্যে আচরণগত একটি দৃঢ়তা ও শৃঙ্খলা বিদ্যমান। যার ফলে প্রায়শই সরকারের নীতিসমূহ বাস্তবায়নে এই দৃঢ়তা ও শৃঙ্খল গতিশীলতাকে শ্লথ করে, জনসেবা বিঘ্নিত হয়, উন্নয়ন কর্মকান্ডের গতি ও প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়।

Max Weber এর যে আমলাতান্ত্রিক paradigm যাকে ব্যাখ্যা দেন আদর্শ আমলাতন্ত্র হিসাবে, সেই আমলাতন্ত্রের কতগুলো কাঠামোগত ও আচরণগত দুই ধরনের কিছু বৈশিষ্ট্য তিনি উল্লেখ করেন।

কাঠামোগত	আচরণগত
১। শ্রম বিভাজন-প্রতিটি ক্ষেত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত স্থানে কর্মে নিয়োজিত করা হবে।	১। আমলাতন্ত্রে কঠোর সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
২। পদ সোপান-প্রত্যেক ব্যক্তি তার উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট কর্মের জন্য দায়ী। অর্থাৎ উর্ধ্বতন অধঃস্তন সম্পর্ক ব্যবস্থা।	২। আমলাতন্ত্র কারও প্রতি অনুরাগের বশবর্তী না হয়ে কাজ করে যায়।
৩। আইন কানুন-প্রতিটি কার্যক্ষেত্রে সুষ্ঠু নিয়ম নীতির চর্চা।	৩। কর্মীগণ কার্য সম্পাদনের সময় আনুষ্ঠানিক নিয়ম নীতির বাইরে যাবে না।
৪। নৈর্ব্যক্তিকতা-প্রতিটি কর্মীর নিরপেক্ষ আচরণের বাধ্যবাধকতা।	
৫। ভবিষ্যত উন্নয়ন-যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার জন্য পুরস্কৃত হবে।	

আমলাতন্ত্র এবং বর্তমান প্রশাসন ঃ যদি সরকারকে একটি ব্যবস্থা (system) হিসাবে ধরা হয় তবে বাংলাদেশ সচিবালয় একটি বড় ধরনের sub-system, সচিবালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় নিয়ে গঠিত এবং মন্ত্রণালয় আবার কতগুলো ডিভিশনে বিভক্ত। Rules of Business অনুযায়ী বিভিন্ন branch, section এবং wing এর দায়িত্ব, কাজের বিস্তৃতি এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়।

বাংলাদেশের লোক প্রশাসন

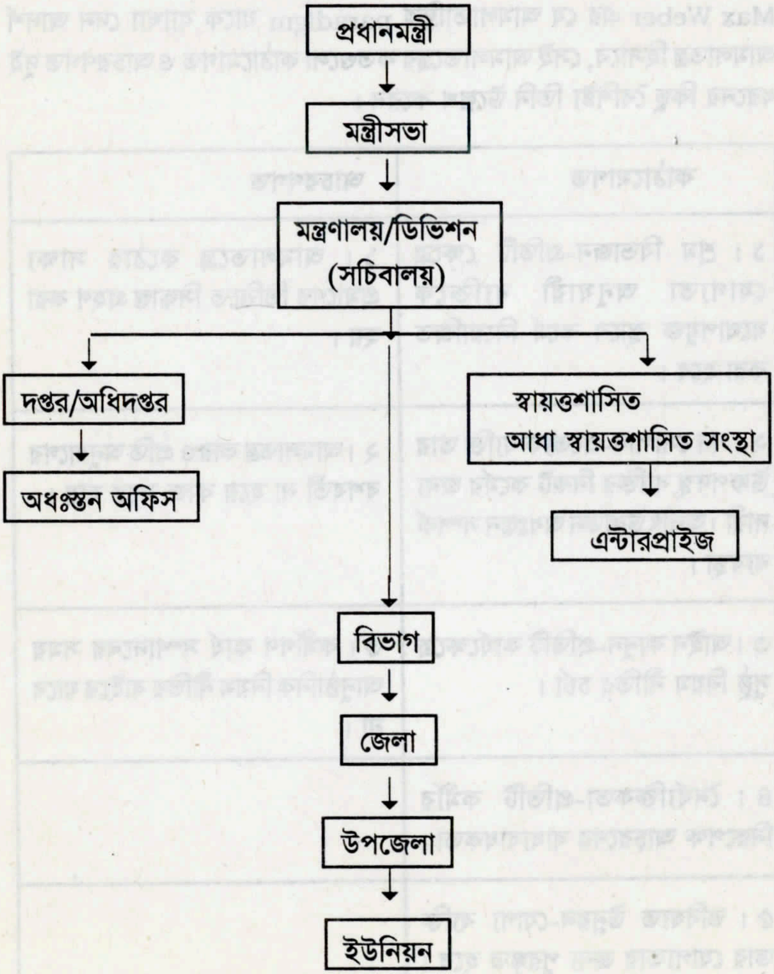

Huda এবং Rahman *Functionaries of The Bangladesh Secretariat* লেখায় উল্লেখ করেন, "In the Bangladesh Secretariat, sections are organized on either basis. In some ministries however, there is a mix of both the principles, chain of command, specialization and uniformity of standard. Organization by process may result in unequal distribution of work between sections whereas organization by purpose creates needs for heavy coordination" এবং সাথে সাথে disposal of case এ যে সময়ক্ষেপণ তার কারণ হিসাবে বলেন, "The most obvious reason for delay in the Secretariat is the heavy workload the ministries assume for themselves. Although the workload is rationally distributed among various hierarchical levels in the secretariat, unfortunately, those allocations of business have been swept aside by a practice called jurisdictional infringements."

সুতরাং পদসোপানগত সমস্যাটি আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার গতিকে শ্লথ করে। Henry Fayol তার গ্রন্থে যে Gang plank এর কথা বলেছেন তার গ্রহণযোগ্যতা বা ব্যবহার এদেশের প্রেক্ষাপটে অনুপযোগী।

বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) ধারায় বলা আছে "সকল সময় জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" বর্তমান সময়ের আমলারা বহুত্ববাদী মনোভাব সম্পন্ন। এর কারণ হচ্ছে পারিবারিক পটভূমি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, চাকরিগত মর্যাদা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে এমাজউদ্দিন আহমেদ তাঁর Bureaucratic Elites in Segmented Economic Growth গ্রন্থে বলেন, "অধিকাংশ কর্মচারীর সরকারী চাকরিতে যোগদানের অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্ষমতা, অর্থ, চাকচিক্য, তবে জনসেবা নয়। অথচ তাদের বলা হয় 'জনগণের সেবক'।

Career planning অনুযায়ী প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তি তার যোগ্যতার স্বীকৃতি পাবে এবং যথাসময়ে পদোন্নতি এক ধরনের স্বীকৃতি।

Personnel manual এর chapter II এর 11.01 এ বলা আছে, promotion of a government servant in the right time not only boosts the moral of the employee but also increases efficiency of the organization to which he belongs. So it is imperative on the part of the administrative ministry/divi-

sion/department concerned to take prompt action on promotion case of its employees when promotions are due এবং এ ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ যা পরবর্তীতে অর্ন্তদ্বন্দ্বে রূপ নেয় এবং বাংলাদেশে তা দৃশ্যতঃ বিদ্যমান।

Wareen Bennis আমলাতন্ত্রকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন তা আলোচনা করলে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রের অকার্যকারিতা এবং এর পশ্চাতে যে কারণগুলো বিদ্যমান সে সম্বন্ধে একটি ধারণা পাওয়া যায় তাঁর মতে–

১. আমলাতন্ত্র ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের যথার্থ বিকাশে অনুমতি দেয় না

২. বশ্যতা এবং দলীয় চিন্তার বিকাশ ঘটায়

৩. অনানুষ্ঠানিক সংগঠন এবং জরুরী প্রত্যাশিত সমস্যাকে স্বীকৃতি দেয় না।

৪. পর্যাপ্ত আইনগত প্রক্রিয়া নেই

৫. পার্থক্য দূরীকরণ, পদের বিরোধ এবং নির্দিষ্ট কার্যগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ মিটানোর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয় না এবং

৬. অবিশ্বাস এবং প্রতিহিংসার ফলে মানবীয় সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার সম্ভব হয় না।

দু'টি কারণে এ অকার্যকারিতা সৃষ্টি হতে পারে–

১) প্রশাসনিক কাঠামোর দুর্বলতার জন্য এবং

২) ব্যক্তির আচরণের মাধ্যমে, যা তার শিক্ষাগত, সামাজিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল। এটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে, যেমন–

- একজন আমলা আইন কানুনের দোহাই দিয়ে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা করেন
- সম মর্যাদা সম্পন্ন একজন আমলা দায়িত্ব এড়ানোর জন্য কোন কাজের দায়িত্ব তাঁর একজন সহকর্মীর উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। পরবর্তীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে
- এক ধরনের কর্মকর্তা আছেন যারা কোন কাজের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেন
- এক ধরনের কর্মকর্তা আছেন যারা কাজকে দীর্ঘায়িত করে সমস্যা বাড়িয়ে তোলেন
- অনেক সময় আমলারা কোন প্রয়োজনীয় অথচ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব বা সিদ্ধান্ত নিতে চান না এবং

- কর্মকর্তারা কর্তৃত্বকে পদমর্যাদার সূচক হিসাবে ব্যবহার করেন। তাই তাঁরা কোন শূন্যস্থান পূরণ করতে কাউকে না জানিয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

আধুনিক লোক প্রশাসনের চারটি প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে-

১. **Distributive Process :** সরকারী সেবা এবং পণ্যের সুষ্ঠু এবং সুষম বন্টন এবং এ বন্টন কতটা 'সর্বাধিক সামাজিক সুবিধার নীতি' অনুযায়ী হয়েছে তা' নির্ণয় করা যায় cost benefit analysis এর মাধ্যমে। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যেগ্রামীণ উন্নয়ন বা অবকাঠামোগত উন্নয়নের নামে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে তার কতটুকু প্রকৃত অর্থে ব্যয়িত হচ্ছে এবং তার সুবিধা দেশের জনগণের কত অংশ পাচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটা বিশেষ গোষ্ঠী এ সকল সুবিধা পাচ্ছে। সরকারী অর্থ ও সম্পদের অপব্যয় এবং অপব্যবহার সুষ্ঠু সেবা বন্টনে প্রতিবন্ধকতা। আমাদের GDP 'র ৪.৫ কেবলমাত্র আমলাদের wage bill এ ব্যয়িত হয়। Total Quality Management (TQM)- এর ধারণাটি অর্থাৎ মানসম্মত সেবা,কম খরচে উৎপাদন এবং জনগণের সন্তুষ্টি, এদেশে সম্ভব হচ্ছে না।

২. **The Integrative Process :** কাজের মৌলিক দিক হচ্ছে 'প্রজেক্ট টিম' যার মানে এসব বৈশিষ্ট্য যুক্ত থাকার আর্থিক স্বায়ত্তশাসন পরিস্থিতিতে প্রযুক্তি সরবরাহ। অন্যান্য প্রজেক্ট টিমের মধ্যকার আত্মনির্ভরশীলতা। গতানুগতিক পদসোপান পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে।

৩. **Boundary Exchange Process :** সরকারী প্রশাসন এবং এর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য কর্পোরেশন দপ্তর এবং কর্মচারীদের মধ্যে সাধারণ সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে legislature, elected exceutive, pressure group, auxiliary staff.

৪. **The Socio Emotional Proeess :** এ প্রক্রিয়াকে sensitivity training technique বলা হয় যার মাধ্যমে দ্বন্দ্বমূলক পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের মনোবলকে শক্তিশালী করা যায় এবং তাকে আরও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেয়ার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশে যে সকল আমলারা সচিবালয়ে কর্মরত তারা যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। সরকারী প্রশিক্ষণ নীতিও স্বচ্ছ নয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও সঠিকভাবে কার্যকরী নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন ব্যক্তি যে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, তাকে সে ক্ষেত্রে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না এবং উপযুক্ত প্রক্রিয়াগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা প্রশাসন যন্ত্র বা রাজনৈতিক সংগঠন

প্রয়োজন তা আমাদের দেশে নেই। ফলে তত্ত্বকে বাস্তবে রূপ দিতে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য এক বা একাধিক সংস্থা রয়েছে যার কোন প্রয়োজন ছিল না। এতে কাজে জটিলতা বাড়ে। কিন্তু ব্যাংক এর ১৯৯৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা অন্যান্য দেশ যেমন মালয়েশিয়া (২৪), জাপান(১৪), ইংল্যান্ড (১৬) এর চেয়ে বেশি।

মন্ত্রণালয়ের প্রবৃদ্ধি

বৎসর	মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা	ডিভিশন	স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা	বিভাগ/ অধিদপ্তর
১৯৮২	১৮	৪৪	১০৯	১৮১
১৯৮৫	২৬	–	–	–
১৮৮৪	৩৫	৪৯	১৩৯	২২১

উৎস ঃ WB -১৯৯৬

নব্য লোক প্রশাসনের মূল্যবোধ এবং তা অর্জনের জন্য যে যে পন্থা প্রয়োজন তা নিম্নে আলোচিত হ'ল ঃ

মূল্যবোধ	কাঠামোগত পন্থা
১) দায়বদ্ধতা---------------------	বিকেন্দ্রীকরণ (রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ);
২) সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মী এবং -------- জনগণের অংশগ্রহণ	প্রাকরণ কর্মদল, সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় কর্মীর অংশগ্রহণ;
৩) সামাজিক সমতা --------------	কার্যকরী কর ব্যবস্থা, সরকারী সেবায় সমতা;
৪) জনগণের পছন্দ ---------------	পছন্দের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে সেবার বিভিন্ন বিকল্প সৃষ্টি;
৫) প্রশাসনিক জবাবদিহিতা---------	বিকেন্দ্রীকরণ, ক্ষমতা অর্পণ।

বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এক ধরনের সাড়া পাওয়া যায়। বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতা দেশের সকল প্রশাসনিক স্তরের মধ্যে বন্টিত হয়। এই সব প্রশাসনিক স্তরকে বলে স্থানীয় সরকার। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে এবং স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন, তবে এজন্য স্থানীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেয়া উচিত। কিন্তু আদৌ কি তা হচ্ছে? স্থানীয় সরকারের আয়ের প্রধানতম উৎস সরকারী অনুদান এবং এ অনুদান স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে অনুদান প্রাপ্যতা। উন্নয়নে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বর্তমান ভূমিকা অনুসন্ধানের বিষয়, বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের আমলারা কর্তৃত্ববাদী মনোভাব সম্পন্ন এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণে বিশ্বাসী।

সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু আমলারা জনগণমুখী নয়। Closed system এর সকল বৈশিষ্ট্য আমলারা ধারণ করেন। যেখানে আমলাদের উচিত মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করা, সেখানে কার্যত তা হয় না। তারা সব সময় নিজেদের সংকুচিত করে রাখেন। জবাবদিহিতার প্রশ্নে সরকারী চাকুরীতে আমলাদের সামাজিক মর্যাদা, পদ মর্যাদা এবং ক্ষমতা তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; যার ফলে জবাবদিহিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে না।

জনগণের অংশগ্রহণের কথা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই অর্থে কি পরিমান অংশগ্রহণ হচ্ছে তা জানা প্রয়োজন। BARD এর একটি সমীক্ষায় একটি উপজেলার নিম্নরূপ চিত্র দেখা গেছে ঃ

Nature of involvement	**No. of respondents**	**% of total**
Sold labor for project implementation	9	21.4
Worked as a member of the project		
implementation committee	1	2.4
Govt. voluntary labour force project	1	2.4

Source : Decentralization of administration in Bangladesh, Syed Margub Murshed, et. al., p. 113.

উপসংহার

আধুনিক লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক চর্চার ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা কম বেশি সকল দেশেই লক্ষ্যণীয়। তবে প্রায়োগিক দিকের উন্নতির জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনয়ন। আমলাদের পেশাগত দক্ষতার অহমিকা এবং তাদের ঔপনিবেশিক মন মানসিকতা আমলাতন্ত্রকে আরও কল্যাণমুখী করে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে। কাজেই আমলাতন্ত্রকে আধুনিক সমাজের উপযোগী করে ঢেলে সাজাতে না পারলে তাত্ত্বিকভাবে প্রশাসনিক সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়নে আমলাতন্ত্রকে যতই উত্তম ব্যবস্থা বলে অভিহিত করা হোক না কেন, আমলাতন্ত্র সম্পর্কে প্রচলিত নেতিবাচক ধারণাকে দূরীভূত করা সহজ হবে না। সর্চোচ্চ পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ এবং সংগঠনে মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে আমলাতন্ত্রকে আধুনিক রাষ্ট্রের উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের রাজনৈতিক কাঠামো এখনও বিভিন্ন দুর্বলতায় আচ্ছন্ন বলে আমলাতন্ত্র এখানে বহুবিদ পন্থায় রাষ্ট্র কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে প্রভূত্ব বিস্তার করে রেখেছে। তাই প্রয়োজন শক্তিশালী রাজনৈতিক কাঠামো এবং এর মাধ্যমে তত্ত্ব এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

তথ্য নির্দেশিকা

খান, আবু তাহের (১৯৯৫), ***শিক্ষা সংগঠন, প্রশাসন ও আমলাতন্ত্র ঢাকা :*** বাংলা একাডেমী।

Henry, Nicholas (1995), ***Public Administration and Public Affair, Englewood Cliffs***

ভূঁইয়া, মোঃ শাহজাহান হাফেজ (১৯৯৮), ***জন কল্যাণকামী আমলাতন্ত্রের সন্ধানে, উন্নয়ন বিতর্ক,*** বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, পৃঃ ৪৮-৫১।

Huda, A. T. M. Shamsul (1990), ***Functions and Functionaries of the Bangladesh Secretariat,*** Bangladesh Journal of Public Administration, BPATC, Vol. V, No.-5, Jan. 1998, Page-6.

রহমান, মোঃ মকসুদর (১৯৯৩), ***বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রাজশাহী :*** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান । আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

Personal Manual, Ministry fo Establishment.

Karim, M. A. (1998), ***Resturcturing The Bangladesh Secretariate :*** Bangladesh Journal of Public Administration, BPATC, Vol. VII, No.-1 & II, 1998, 76

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
বিক্রয়যোগ্য প্রকাশনার তালিকা

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশ্লেষণ, ১৯৬৪	– ডব্লিউ, ডব্লিউ রসটো	টাঃ ৬.৫০/-
২।	প্রশাসনের বিভিন্ন পদ্ধতি ১৯৭০	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ৬.৫০/-
৩।	প্রশাসনের মূলনীতি ১৯৭১	যাহিদ হোসেন -সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৪।	প্রবীন প্রশাসকের অভিজ্ঞতাঃ স্মৃতিচারণ ১৯৮৪	নীলুফার বেগম-সম্পাদনায়	টাঃ ১৮/-
৫।	সরকারী কর্মচারী মহিলা নির্বাহী বিকাশের সমস্যা ১৯৮৭	নীলুফার বেগম	টাঃ ৬.৫০/-
৬।	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে মহিলা ১৯৮৮	এ, কে, এম হেদায়েতুল হক ও হীরালাল বালা	টাঃ ১২০/-
৭।	সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ১৯৯৪	নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান, সম্পাদক	টাঃ ১২৫/-
৮।	বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা পঞ্চম বর্ষ সংখ্যা, নভেম্বর	বণিক গৌর সুন্দর	টাঃ ৪০/-
৯।	Bangladesh Journal of Public Administration Volume VII Number 1 & II	ড. মীর ওবায়দুর রহমান সম্পাদক	টাঃ ৪০/-
১০।	লোক-প্রশাসন সাময়িকী সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০	মোঃ শফিকুল হক-সম্পাদক	টাঃ ১৫/-
১১।	The Deputy Commissoner in East Pakistan 1964	A. M. A. Muhith	টাঃ ১৬/-
১২।	Administration Policy of the Government of Bengal, 1965	Rokeya Rahman Kabeer	টাঃ ৩০/-
১৩।	Bengal Dist. Administration Committee, 1966 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৩৫/-
১৪।	Famine Manual, 1967 - Govt. of Bengal	Publish by NIPA	টাঃ ৭/-
১৫।	Problems of Municipal Administration, 1968	M. A. Hussain Khan	টাঃ ৩৫/-
১৬।	Our Cities and Towns, 1970	Md. Jainul Abdin Ed.	টাঃ ২৩/-
১৭।	Administration reforms in Pakistan, 1970	A. N. Shamsul Hoque	টাঃ ৩০/-
১৮।	Social and Administrative Research in Bangladesh, 1973	Naj Nor Begam	টাঃ ১৬/-
১৯।	Social Change and Development in South Asia 1978	Lutful Haq Chowdhury	টাঃ ৪৫/-
২০।	District Administration in Bangladesh 1978	Qazi Azhar Ali	টাঃ ২২/-
২১।	Bangladesh Public Administration and Senior Civil Servants, 1984	Ali Ahmed	টাঃ ৫০/-
২২।	Post-Entry Training in Bangladesh Civil Service : The Challenge and response 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ৪০/-

নং	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
২৩।	Career Planning in Bangladesh, 1986	Published by BPATC SAVAR, Dhaka	টাঃ ১২০/-
২৪।	Sustainability of Project for Higher Agriculture Education, 1988 & Others	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৫।	Approaches to Rural Health Care : A Case Study of Gonoshastya Kendra, 1988	A. T. M. Shamsul Huda and others	টাঃ ৪০/-
২৬।	Sustainability of Rural Development Project : A Case Study of Rural Development Project in Bangladesh 1988	Akar Ali Khan and others	টাঃ ৪০/-
২৭।	Sustainability of Primary Education Project in Bangladesh, 1989	A. K. M. Hedhayetul Huq and others	টাঃ ৪০/-
২৮।	Hand Book for the Magistrates, 2nd Ed.1990	Z. A. Shamsul Haq others	টাঃ ১০০/-
২৯।	A Study of the Use of Computers in Management Decision Making in the Public Sector of Bangladesh, 1991	Dr. Ekram Hassain and others A. K. M. Enamul Haque A. Z. M. Shafiqul Alam	টাঃ ৫০/-
৩০।	Administrative Science Review	Published by NIPA	টাঃ ১৫/-
৩১।	Decentralization & People's Participation in Bangladesh, 1983	Dr. Sk. Maqsood Ali M. Safiur Rahman Kshanada Moham das	টাঃ ১৫০/-
৩২।	The Revenud Administration of North Bengal, 1970	A. B. M. Mahmood	টাঃ ৩০/-
৩৩।	Hospital Administration, 1969	N. N. Chowdhury ed.	টাঃ ১৮/-
৩৪।	Survey of In-service Training Institution in East Pakistan, 1969	Syed Nuruzzaman	টাঃ ১৫/-
৩৫।	Bureaucracy in Bangladesh Perspective	A. Z. M. Shamsul Alam	টাঃ ৫০০/-
৩৬।	Limiting the Role of State Prescription of the World Bank & the Bangladesh Economy	Dr. Mir Obaidur Rahaman	টাঃ ১০০/
৩৭।	The Assessment of El Nino Impacts and Responses	Dr. Ekram Hassain and others	টাঃ ২৫০/-

আরো তথ্য এবং ক্রয়ের অর্ডার দেয়ার জন্য প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-১৩৪৩। এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

লোকপ্রশাসন সাময়িকী বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যতম নিয়মিত প্রকাশনা, এটি কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক জার্ণাল। প্রতি ইংরেজী বছরের জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই ও অক্টোবর মাসে এ সাময়িকী প্রকাশিত হয়। লোক প্রশাসন সাময়িকীতে কেন্দ্রের অনুষদ সস্য, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষকবৃন্দ, বিভিন্ন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কর্তৃক বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় লিখিত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তবে লোক-প্রশাসন, উন্নয়ন অর্থনীতি, ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রবন্ধ এ সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য অধিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়।

◆ প্রবন্ধটি মৌলিক বং অন্য কোন জার্ণালে বা সাময়িকী, সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বা প্রকাশের জন্য প্রেরিত হয়নি-এ মর্মে প্রবন্ধ জমাদেয়া বা প্রেরণের সময় একটি লিখিত বিবৃতি প্রদান করতে হবে.

◆ লেখা মান সম্পন্ন সাদা কাগজে (রিপোর্ট সাইজ) পর্যাপ্ত মার্জিন রেখে এক পৃষ্ঠায় ১২ ফন্টে ডাবল স্পেসে কম্পিউটারে মুদ্রিত হতে হবে। মুল পান্ডুলিপির সংগে অবশ্যই কম্পিউটার ডিস্কেটে প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। কম্পিউটার কম্পোজের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ফন্টের ব্যবহার অনুসরণ করতে হবেঃ বাংলা কম্পোজ ঃ "প্রশিকা শব্দ (লিপি নরমাল)" ফন্ট

ইংরেজী কম্পোজ ঃ "টাইমস নিউ রোমান" ফন্ট

◆ প্রেরিতব্য কম্পিউটার ডিসকেটের কভারে লেখকের নাম, লিখিত প্রবন্ধের নাম এবং সংশ্লিষ্ট ফাইলের নাম উল্লেখ থাকতে হবে

◆ প্রবন্ধে বাংলা একাডেমী অনুমোদিত বানান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে

◆ মুল কপিসহ পান্ডুলিপির ২ (দুই) প্রস্থ (পরিচ্ছন্ন কপি) সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে। প্রবন্ধের উপর আলাদ কাগজে (কভারপেজ) প্রবন্ধের শিরোনামসহ লেখকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে, প্রবন্ধের কোথাও লেখকের নাম উল্লেখ করা যাবে না

◆ ভিন্ন কাগজে লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রবন্ধের সাথে সংযুক্ত করতে হবে

◆ প্রত্যেক লেখার সাথে অবশ্যই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার (Abstract) ইংরেজীতে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের পাদটিকায় ও তথ্যপঞ্জিতে লেখক, গ্রন্থ স্থান, প্রকাশক, বছর ও পৃষ্ঠা এবং সাময়িকীর ক্ষেত্রে লেখক, প্রবন্ধের নাম, সাময়িকীর নাম, খন্ড ও ইসু সংখ্যার বছর ও পৃষ্ঠা প্রচলিত প্রমিত নিয়ম (Standard) অনুসারে উল্লেখ করতে হবে

◆ প্রবন্ধের আকার ৬০০০ শব্দের (২০ মুদ্রিত পৃষ্ঠা) মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে

◆ লেখা প্রকাশিত হলে লেখক সাময়িকীর ২ কপি ও প্রবন্ধের ২৫ কপিং অনুলিপি বিনামূল্যে পাবেন

◆ প্রাপ্ত প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সম্পাদনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং অমনোনীত প্রবন্ধ ও ডিসকেট সাধারণত লেখককে ফেরৎ দেয়া হয় না, তবে বিশেষ প্রয়োজনে ফেরৎ পেতে হলে এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার লেখককে বহন করতে হবে।

◆ মুদ্রিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে প্রতি মুদ্রিত পৃষ্ঠার (৩০০ শব্দের পৃষ্ঠা) জন্য লেখককে ২০০ (দুইশত) টাকা হারে সম্মানী প্রদান করা হবে।